‘বঙ্গমহিলা’র ‘অন্তঃপুর’ ১৮৭৫- ১৯০৩, উনিশ শতকের বাংলার নারীশিক্ষা ও নারীচরিত্র নির্মাণের ধারা

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্র, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

সাহানা ঘোষ দস্তিদার

ক্রমাঙ্ক : ০০১৭০০২০৩০২০

রেজিস্ট্রেশন নং : ১১৮৮১৫, ২০১২-১৩

পরীক্ষা ক্রমাঙ্ক : MPCO194020

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর সুচরিতা চট্টোপাধ্যায়

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৩২

মে, ২০১৯

Certified that the thesis entitled, **'বঙ্গমহিলা'র 'অন্তঃপুর' ১৮৭৫-১৯০৩, উনিশ শতকের বাংলার নারীশিক্ষা ও নারীচরিত্র নির্মাণের ধারা** , submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Comparative Literature of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is being carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at the department of Comparative Literature of Jadavpur University, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

_____

(Full signature of the M.Phil Student with
Roll number and Registration number)

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Ms Sahana Ghosh Dastidar, entitled **'বঙ্গমহিলা'র 'অন্তঃপুর' ১৮৭৫-১৯০৩, উনিশ শতকের বাংলার নারীশিক্ষা ও নারীচরিত্র নির্মাণের ধারা**, is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in the department of Comparative Literature of Jadavpur University.

Head	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC

Department of Comparative Literature

মুখবন্ধ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য পড়তে আসার সুবাদে উনিশ শতক কালপর্বটির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ তৈরি হয়। সেই সূত্রেই তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে এম.ফিলের গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে উনিশ শতককে বেছে নিতে দেরি হয়নি। গবেষণা কাজটিতে যিনি সর্বতভাবে পাশে থেকেছেন, সময়ে সময়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়ে কাজটিকে সমৃদ্ধ করেছেন, যাঁকে ব্যতীত কাজটি আদৌ সম্পন্ন হতো না, তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের সম্মানীয়া অধ্যাপিকা প্রফেসর সুচরিতা চট্টোপাধ্যায় ম্যাডাম। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ধন্যবাদের কোনও শব্দই তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। তাঁরই পাশাপাশি এই বিভাগেরই ওপর সম্মানীয় অধ্যাপক শ্রী কুণাল চট্টোপাধ্যায় স্যারের কাছেও আমি ঋণী। এরই সঙ্গে বলতে হয় আমার সহপাঠীদের কথা, তাঁরা প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাতে চাই, তুলনামূলক সাহিত্য এবং বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা আমাদের নানান উপদ্রব সহ্য করেও পাশে থেকেছেন। বাংলা বিভাগের স্যার, শ্রীশাশ্বত ভট্টাচার্যের কাছেও আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার উনিশ শতক সম্বন্ধে যা কিছু জানা, তার শুরু স্যারের হাত ধরেই। সিনিয়র এবং শিক্ষক অপরূপা ঘোষের কাছেও আমি ঋণী। এরই সঙ্গে বলতে হয়, সিনিয়র দিদি, শাশ্বতী রায় এবং স্নেহা সেনের কথা। তাঁরা বই দিয়ে যে পরিমাণ সাহায্য করেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এছাড়া বলতে হয়, পরিবারের কথা। মা, বাবার আশীর্বাদ এবং বোনের উৎসাহ ছাড়া গবেষণা করা সম্ভব হতো না। ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমার বহুদিনের সঙ্গী, শ্রীসৌরভ দেবনাথকে। সময়ে সময়ে তাঁর সাহায্য ছাড়া গবেষণাটি শেষ হতো না। এছাড়া ধন্যবাদ শুভেন্দু দা'কে, যথাসময়ে টাইপিং- এর খুঁটিনাটি শিখিয়ে তিনি আমাকে পুরো গবেষণা পত্রটি টাইপ করতে সাহায্য করেছেন। আর বলতে চাই, আইচ কপিয়ার সেন্টারের কথা, তাঁরা এভাবে প্রিন্ট আউট দিতে সাহায্য না করলে কাজটি অধরা থেকে যেত। এছাড়াও সবশেষে সেই সকল গ্রন্থাগারিকদের অজস্র ধন্যবাদ যাঁদের জন্য আমি সময়ে সময়ে সকল বই এবং পত্রিকার হদিশ পেয়েছি। তাঁদের ওপর অসহনীয় উপদ্রবের জন্য আমি আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা সংখ্যা
• ভূমিকা	১ - ৮
• প্রথম অধ্যায়	৯ – ৪৫
• দ্বিতীয় অধ্যায়	৪৬ – ৮২
• তৃতীয় অধ্যায়	৮৩ – ১২১
• চতুর্থ অধ্যায়	১২২ – ১৪১
• উপসংহার	১৪২ – ১৪৫
• পরিশিষ্ট	১৪৬ – ১৬৬
o 'অন্তঃপুর' (৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষ) ও 'বঙ্গমহিলা'র (১ম ও ২য় বর্ষ) কালানুক্রমিক সূচি	১৪৬ – ১৬০
o 'অন্তঃপুর' ও 'বঙ্গমহিলা'য় প্রকাশিত কিছু ছবি	১৬১ – ১৬৬
• গ্রন্থপঞ্জি	১৬৭ – ১৭০

ভূমিকা

১৮৭৫ সাল, বঙ্গবাসিনীদের হাতে সময়ে সময়ে নীতিমূলক এবং জ্ঞানগর্ভমূলক কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রকাশিত হল 'বঙ্গমহিলা', চোরাবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমিতির দ্বারা পরিচালিত একটি মাসিক পত্রিকা, নাম থেকেই স্পষ্ট কেবলমাত্র মহিলাদের উদ্দেশ্য করে এই পত্রিকাটি। ১৮৯৭ সাল, 'কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত' পত্রিকা 'অন্তঃপুর' প্রকাশিত হচ্ছে। উনিশ শতকের দুটি পত্রিকা, মহিলাদের জন্য প্রকাশিত। কিন্তু হঠাৎ মহিলাদের জন্য আলাদা পত্রিকার প্রয়োজন হল কেন, সেই গল্পের আরম্ভেরও আরম্ভ আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলায় বিদেশি যে ভাবধারা শুরু হয়েছিল, তাকে অবহেলা করার মত শক্তি বাঙালি সমাজের ছিল না। সুতরাং বাঙালি সমাজের 'বাহির'-এর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি পরিবারের 'অন্দর'-এও ঘটছিল বেশ কিছু বদল। তার প্রধান প্রমাণ উনিশ শতকীয় শিক্ষিত সমাজ ভাবছিল তাদের 'নারী'-দের কথা। এই সময় থেকেই শিক্ষিত বাঙালি সমাজ সমাজ-পরিবর্তনের বিষয়ে যা আলোচনা করেছে তার প্রায় সিংহভাগ জুড়ে স্থান পেয়েছে নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা প্রমুখ বিষয়গুলো। প্রাচীন ও মধ্যযুগে মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে তেমন কোন জোরালো মত পাই না, যদিও প্রাচীন ভারতে একাধিক বিদূষী নারীর খোঁজ পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শুরুতে বাঙালি সমাজে যে আলাদা করে মেয়েদের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল এমন কথা আদৌ বলা যায় না। পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের দিক থেকে দেখা সম্ভবপর ছিল না। বাল্যবিবাহ ছিল ভীষণ মাত্রায় সক্রিয়, 'ঠিক' সময়ে মেয়েদের বিয়ে দিতে না পারলে সমাজে 'একঘরে' হতে হত, কখনো বা 'জাত' যেত। আর গৌরীদানের পুণ্যের কথা তো

ব্রাহ্মণসমাজ এত দৃঢ়ভাবে সাধারণ মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল যে আলাদা করে মেয়েদের অধিকার নিয়ে দাবী তোলার প্রশ্ন সেইসব মানুষদের মনে আসেনি। তাছাড়া খুব স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের পর মেয়েরা ঘরের কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকত যে পুঁথি শিক্ষার সময়, বিলাসিতা, সুযোগ, বা প্রয়োজন কোনটাই তাদের ঘটেনি। মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে উনিশ শতকের শুরুর দিকেও বাঙালির মনে নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, যেমন মেয়েরা পড়াশোনা শিখলে বিধবা হয়, অসতী হয় ইত্যাদি। অবশ্য বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার বেশ কিছু সময় পরেও একদল মানুষ এই ধরনের প্রচারে পিছপা হননি। যদিও উনিশ শতকে দেখব শিক্ষিত বাঙালি সমাজ ধীরে ধীরে স্ত্রী-শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠছে। এই দলে অবশ্যই আছেন, রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব থেকে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত মানুষেরা। অবশ্যই ইয়ংবেঙ্গলও এই কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে ছিল না। যদিও বাংলায় নারীশিক্ষার ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারীরা।

কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রয়াস নিতান্তই উদ্দ্যেশ্যপ্রণোদিত ছিল। শিক্ষার আড়ালে ধর্মপ্রচার করাই ছিল এদের আসল উদ্দ্যেশ্য। এদের স্কুলগুলোতে বাইবেল অবশ্যপাঠ্য হওয়ায় সাধারণ মানুষের মনে এদের সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল না। ফলে এই প্রচেষ্টাও কার্যকর হয়নি। এরপর ইয়ংবেঙ্গলের কথাও বিশেষ ভাবে বলতে হয়। তবে বেথুন বিদ্যালয় স্থাপনের পর স্ত্রী-শিক্ষার এক নতুন দিক দেখা গেল, যদিও এইসময় ছাত্রী সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। বহু বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়েও অনেককাল চলেছিল বেথুন স্কুল। এইসময় কলকাতার আশেপাশে বেশ কিছু জায়গাতেও মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপনের খবর পাওয়া যায়। তবে কাশীপুরে নিজের বাড়িতে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বা কয়েকজন ব্রাহ্ম যুবকের মজিলপুরে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়াস প্রমাণ করে না যে বাঙালিদের মেয়েদের

বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে আর কোন আপত্তি ছিল না। ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সংখ্যা শুধু যে নগণ্য ছিল তাই নয়, চারিদিক থেকে নানা বিরোধও দানা বাঁধছিল। এই অবস্থায় মেয়েদের শিক্ষার বিকল্প যে পদ্ধতি তৈরি হল তা অন্তঃপুর শিক্ষা ব্যবস্থা। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম উদ্যোগী ছিলেন ব্রাহ্মরা। তাঁরা এই অন্তঃপুর শিক্ষা পদ্ধতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। বস্তুতপক্ষে উনিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি মেয়েদের বেশিরভাগই ছিলেন হয় খ্রিস্টান নয় ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মরা যত তাড়াতাড়ি পশ্চিমী সভ্যতা সম্পর্কে ছুঁৎমার্গ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন, বাকিরা তা পারেননি। ফলে সাধারণ মহিলাদের শিক্ষা থেকে গেছে অসম্পূর্ণ। যেখানে মেয়েরা ছোটবেলায় লেখাপড়া করত সেখানেও বাল্যবিবাহের কারণে 'বোধোদয়' বা 'আখ্যানমঞ্জরী'তেই 'চারুপাঠ' শেষ হত। বিয়ের পর বাড়ির বউয়ের প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে যাওয়া উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের পক্ষে ছিল নিতান্তই অসম্ভব। আর শ্বশুরবাড়িতে কাজের চাপে সময় ও সুযোগ হত খুবই কম, তাই বাড়িতে বসে লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল এই অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী। কেশব সেনের উদ্যোগে শুরু হলেও পরবর্তীকালে এই শিক্ষার ভার বহন করে 'বামাবোধিনী পত্রিকা', মেয়েদের জন্য প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা। এরপর একে একে মেয়েদের জন্য অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। বাঙালি মেয়ের অবস্থার সার্বিক উন্নতিসাধনই ছিল এইসব পত্রিকার উদ্দেশ্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বাড়ছে ও সমাজের অনেকেই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন এবং একই সাথে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তিও প্রচুর, এই দুটো চিত্রই সমানভাবে সত্যি। এমন সময়ে মেয়েদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

উনিশ শতকে মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার পাতা ওল্টালে একটা প্রশ্ন মনে আসে, উনিশ শতকের 'শিক্ষিত', 'সমাজ-সচেতন' ব্যক্তিরা কতটা স্ত্রীশিক্ষা চেয়েছিলেন! সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংকলনে দেখি মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলির বিশেষ ধরনের নামের মিল। কয়েকটি শিরোনাম থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায় — 'হিন্দুনারী', 'পতিব্রতা', 'সুগৃহিণী', 'নারীর কর্তব্য' প্রভৃতি।

এই নামগুলি বারবার ফিরে এসেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীরা বলতেন বিদ্যা গ্রহণে নারীর নারীত্ব নষ্ট হয়, সে ব্যভিচারিণী হয়, সংসারে মন থাকবে না ইত্যাদি। তার উত্তরে পত্রিকাগুলি যেন যুক্তি দিচ্ছে, বিদ্যাশিক্ষা হলে নারী হয়ে উঠবে 'আদর্শ', সে পরিবারের খেয়াল রাখতে শিখবে আরও ভালোভাবে। আমরা লক্ষ্য করব তর্ক হয়েছে স্ত্রী ও পুরুষের পাঠক্রম এক হবে কিনা তা নিয়েও। যারা শিক্ষার পক্ষপাতী তাঁরাও বলেছেন নারী ও পুরুষের প্রবৃত্তি, স্বভাব আলাদা, ফলে উভয়ের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থাই শ্রেয়। এখানে এসেই অদ্ভুৎ ভাবে মিলে যায় নারী শিক্ষার পক্ষের এবং বিরোধী শ্রেণীর মানুষ। স্ত্রীলোকের প্রধান কর্মক্ষেত্র পরিবার, তাই পরিবারের সুখ-শান্তির জন্য, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য এবং সন্তান লালন-পালনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাই মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা এই ছিল তাঁদের মত।

এমনকি এরকম মন্তব্য পাই অতিরিক্ত শিক্ষা মেয়েদের শারীরিক ক্ষতি করে, তাঁরা বিধবা হয়। স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার এমনতর মাথাব্যথা দেখে আমরা সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীর *অন্দরে অন্তরে*-র সঙ্গে একমত প্রকাশ করি , তা হল 'স্ত্রীজনচিত শিক্ষা' আর এই শিক্ষা প্রচারের ম্যানিফেস্টো হল মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলি। তবে শুধু এটুকুই নয়, উনিশ শতকের মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলির এই বিশেষ দেখার ধরন সরিয়ে রাখলে পাশাপাশি

আরও স্বর শোনা যাবে। 'ভারতী' নামে পত্রিকাটি ঠাকুর পরিবার থেকে প্রকাশিত হত, তার কোন দায় ছিল না ধর্মযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার। এই বহুস্বরের মাঝেই নারীর শিক্ষা শুরু হল, শুরু হল তার সামাজিক গতিবিধির নির্ধারণ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকে প্রচুর মেয়েদের পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। 'বামাবোধিনী', 'জ্যোতিরিঙ্গণ', 'অবলাবান্ধব', 'বালারঞ্জিকা', 'বিনোদিনী', 'বঙ্গমহিলা', 'অনাথিনী', 'ভারতী', 'হেমলতা', 'হিন্দুললনা', 'পরিচারিকা', 'সখা', 'বালিকা', 'বঙ্গবাসিনী', 'সোহাগ', 'বিরহিনী', 'সাবিত্রী', 'পুন্য', 'অন্তঃপুর' প্রভৃতি। এই সকলের মধ্যে 'বঙ্গমহিলা' এবং 'অন্তঃপুর' পত্রিকা দুটি বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। ১৮৭৫-১৮৭৭ মাত্র দুবছর চলেছিল 'বঙ্গমহিলা'। মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের চোরাবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়াসে ডঃ ভুবনমোহন সরকারের অধ্যক্ষ সমিতির পক্ষ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এর লিখিত উদ্দেশ্য ছিল

> বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নিতিগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সকল উপহার দেওয়া।[১]

প্রধানত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এরপরে ১৮৯৮-১৯০৩ পর্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছে 'অন্তঃপুর' পত্রিকাটি। বনলতা দেবী, হেমন্তকুমারী চৌধুরী, কুমুদিনী মিত্র প্রমুখ ছিলেন বিভিন্ন সময়ে এর সম্পাদনার দায়িত্বে। 'কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এবং লিখিত' পত্রিকাটি সেই সময়ের তুলনায় প্রায় বিপ্লব ঘটাচ্ছে। এর বিষয়বৈচিত্র্য, লেখনী সেকালের পক্ষে ছিল অনেকটাই নতুন। দুটি পত্রিকা — একটি প্রতিষ্ঠানমুখী, অন্যটি প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত এদের বিভিন্ন সংখ্যায় সেই সময়ের নারীশিক্ষার বাস্তব

১। 'বঙ্গমহিলা' ১ম খণ্ড, ১-১২ শ সংখ্যা, ১২৮২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪১৮/১

ছবিটি তুলে ধরছে। উনিশ শতকের একসময় যখন বিদ্যাসাগর মশাই অনুশোচনা করে বলছেন,

> হা অবলাগণ। তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না। [২]

উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে এই দুটি পত্রিকা কিন্তু তার থেকে অনেকটাই এগিয়ে ভাবছে। উনিশ শতকে বাঙালি হঠাৎ পশ্চিমের সভ্যতার আলো পেয়ে স্ত্রী-শিক্ষা, নারীমুক্তির হয়ে আন্দোলন করে উঠল কিংবা হঠাৎ করে নারীর বন্দীদশায় তাঁরা দুঃখ পেয়ে স্ত্রী-শিক্ষার ব্রতী হলেন – বিষয়টি এত সরলরেখায় এগোয়নি। উনিশ শতকের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত, যোগ্য হলেও তাঁরা তখন পরাধীন জাতি। শাসনভার সেই সময় ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে, এক কথায় 'বাহির' টা নব্য বাঙালির আয়ত্বের বাইরে, এইসময় স্বাভাবিকভাবেই 'ঘর' তাদের কাছে অনেক বেশি কাঙ্খিত হয়। নতুন ভাবাদর্শে দীক্ষিত শিক্ষিত বাঙালির কাছে সেই সময় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক।

যদিও মেয়েদের শিক্ষার প্রণালীটি নিয়ে সে কালে কম বিতর্ক হয়নি। নানা মুনী নানা মত দিলেও এক বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত ছিলেন যে মেয়েদের শিক্ষা হবে পুরুষদের শিক্ষার চেয়ে আলাদা, কারণ তাঁদের মতে মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য আলাদা। তাঁরা শিক্ষিত হবে, পুরুষের মনের মধু জোগানোর জন্য, আরও ভালোভাবে সন্তান পালনের জন্য, সংসারকে আরও মজবুত ভাবে চালানোর জন্য, সুতরাং মেয়েরা জাতে "এ বি শিখে/ বিবি সেজে" বাইরে

২। গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, জানু ২০০১, পৃষ্ঠাঃ ৪৫

না বেরোয় সেইদিকে শিক্ষিত বাঙালি যথেষ্টই নজর রেখেছে এবং শুরু করেছে *সুশীলার উপাখ্যান*।

উনিশ শতকের বাংলায় আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। নানান বিষয়ের মধ্যে নারীশিক্ষা, নারীচরিত্র নির্মাণ — এই ধরণের বিষয়গুলি বারবার উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালিকে ভাবিয়েছে। উনিশ শতক থেকেই কার্যত বাঙালি নারী খুঁজে পেতে চেয়েছে তার পরিচয়, আর এই বিষয়ে সবথেকে বেশি ভূমিকা গ্রহণ করেছে তৎকালীন প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলি, বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য লিখিত পত্রিকাগুলি। এইসব পত্রিকার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম চর্চিত দুটি পত্রিকা, 'বঙ্গমহিলা' এবং 'অন্তঃপুর', অথচ সমকালের দাবীতে এদের ভূমিকা কোনোভাবেই অবহেলা করা যায় না। তাই এই দুটি পত্রিকা নিয়েই আলোচ্য গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করা জরুরি।

চারটি অধ্যায়ে পত্রিকা দুটিকে বিচার করার চেষ্টা করা হবে। চারটি অধ্যায়ের বিষয়ের ভাগটি খানিকটা এরকম-

প্রথম অধ্যায়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকে মহিলাদের জন্য পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, এই অংশে থাকবে তার বিস্তারিত পরিচয় এবং সেই সময়ের নিরিখে তাদের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা। তারা কী বলতে চাইছে, তাদের বিষয় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হবে নারীশিক্ষা নিয়ে পত্রিকা দুটি ঠিক কী অবস্থান গ্রহণ করছে, সমকালের অন্যান্য পত্রিকা গুলির থেকে তারা আলাদা কিছু বলছে নাকি কালের টানাপড়েন তাদেরও একই পথে ঠেলছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য হবে এই অংশের আলোচ্য বিষয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে উনিশ শতকের আধুনিকা তৈরির ক্ষেত্রে পত্রিকা দুটির ভূমিকা কেমন, তারা কেমন নারী নির্মাণ করতে চাইছে, সমাজ, পরিবারের প্রতি তাদের ভূমিকা কী নির্দিষ্ট করা হচ্ছে? সমসাময়িকের থেকে কী পত্রিকা আলাদা কিছু বলছে? নারীর শিক্ষা তারা কোণ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে চাইছে, এই বিষয়গুলি হবে এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে থাকবে পত্রিকায় প্রকাশিত 'পাঠিকা' দের নিজস্ব রচনার পরিচয় ও ব্যাখ্যা। এইখানে আলোচনা হবে সময়ের নিরিখে পত্রিকা দুটির অবস্থান, তাদের সীমাবদ্ধতা বা নতুনত্ব। ২৫ বছরের যাত্রাপথে তারা নারীর যে রূপটি তৈরি করছে, তা নতুন নাকি তারা পুরনো কথারই চর্বিতচর্বণ করছে, বাকী পত্রিকা থেকে বিষয়ের নিরিখে তারা আলাদা, নাকি গড্ডলিকা প্রবাহেই বইছে এমন একটি তুল্যমূল্য আলোচনা উঠে আসবে এই অংশে।

চারটি অধ্যায়ের আলোচনার পরে আমরা দেখতে পারি পত্রিকা দুটি উনিশ শতকের শেষ তিনটি দশকে দাঁড়িয়ে নারীশিক্ষা এবং নারীর চরিত্র নির্মাণের জন্য কি অবস্থান গ্রহণ করছে। সমসাময়িক বাকি পত্রিকার থেকে তাঁরা আলাদা, নাকি পুরুষের চোখ দিয়েই তাঁরা নারীকে দেখতে চাইছে সেই বিষয়টিও আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। এরই সঙ্গে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারব, উনিশ শতকের শেষ ২৫ বছরে নারীপ্রগতির যাত্রায় আমাদের আলোচিত পত্রিকা দুটির ভূমিকা ঠিক কতখানি। এই সকল বিষয় নিয়েই আমরা চারটি অধ্যায়ে এই দুটি পত্রিকার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি।

প্রথম অধ্যায়

> আমার মনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল যে ,আমি একান্ত লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব। তখন আমি মনে মনে মনের উপর রাগ করিতে লাগিলাম।কি জ্বালা হইল, কোন মেয়ে লেখাপড়া শিখে না ,আমি কেমন করিয়া শিখিব ....., তখন আমাদিগের দেশের সকল আচার-ব্যবহারই বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু এই বিষয়টি ভারি মন্দ ছিল। সকলেই মেয়েছেলেকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মেয়েছেলেগুলো নিতান্ত হতভাগা , প্রকৃত পশুর মধ্যে গণনা করিতে হইবেক। [১]

রাসসুন্দরী তাঁর আত্মজীবনীতে যে সময়ের কথা বলছেন, তা ১৮৩০ সালের বাংলা, অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। উনিশ শতকের বাংলার প্রথমার্ধের বাস্তব পরিস্থিতি এইরকম, মেয়েদের জন্য বিদ্যাশিক্ষায় শাস্ত্রে নিষেধ আছে। শুধু রাসসুন্দরী নন, কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮৩৭) দুঃখ করেছিলেন এই বলে যে এদেশের মেয়েরা পশুর জীবন যাপন করে। আবার দ্বিতীয়ার্ধে এই রাসসুন্দরীই তাঁর ইংরেজি শিক্ষিত ছেলের চিঠির উত্তর দেবেন বলে লিখতে শিখছেন। শাস্ত্রের নিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এসবের কুৎসিত দিকগুলি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রয়োজন বলে মনে করছে 'Age of Reason' পড়া উনিশ শতক। এখন উনিশ শতকের এই ভিতটি কিভাবে প্রস্তুত হল তা আলোচনা করা যাক- উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস বুঝতে হলে, শুরু করতে হবে তারও আগে থেকে, কারণ, ইতিহাসের ধারায় আগে পরের যোগাযোগ কখনও উপেক্ষণীয় নয়।[২]

১। বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, *আমার জীবন,* রাসসুন্দরী, নয়াদিল্লি : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০৮, পৃ. ৩৪-৩৫

২। 'বাংলার অর্থনীতি, বাঙালির উনিশ শতক', অশোক সেন, 'উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি'।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ইউরোপীয় নানা দেশের বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। অশোক সেন তাঁর প্রবন্ধে দেখান কিভাবে গোটা আঠারো শতক জুড়ে ইংরেজ কোম্পানি বঙ্গদেশে তাদের আধিপত্য বিস্তার করছে। এবং ক্রমেই বণিকের মানদণ্ড পরিণত হচ্ছে রাজদণ্ডে।

> সে ঘটনা পরম্পরায় মোগল বাদশাহির ক্রমপুঞ্জিত ভাঙন এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত আঞ্চলিক নবাবি রাষ্ট্রশক্তির অনেক দুর্বলতা, অনেক কৃতঘ্নতার হিসেবনিকেশে এখানে ঢুকছি না। তথাকথিত বাংলা সুবা (কোম্পানি প্রশাসনের ভাষায় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) দিয়ে ঔপনিবেশিক দখলদারির সূচনা, আর পলাশীর যুদ্ধ থেকে ধরলে পরের একশ বছরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। বলে রাখা ভালো পুরো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি নয়, প্রকৃত বঙ্গদেশের (ইংরেজিতে Bengal proper) এলাকাতেই সীমাবদ্ধ বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু।[১]

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্বে পাই (১৭০০-১৭২৭) মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ানী ও সুবাদারীর পরিচয়। বিনয় ঘোষ তাঁর ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা’(১৮০০-১৯০০) বইতে মুর্শিদকুলি খাঁ সম্পর্কে বলছেন,

> ঢাকার বদলে মখসুসাবাদ তাঁর শাসনকেন্দ্র হয় এবং সেইজন্য পরে তার নাম হয়, তাঁরই নামে মুর্শিদ-আবাদ। কলকাতার আগে এবং ঢাকার পরে, এই মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলার অন্যতম বড় শহর ও রাজধানী।[২]

১। ‘বাংলার অর্থনীতি, বাঙালির উনিশ শতক’, অশোক সেন, ‘উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি

২। বিনয় ঘোষ, ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা’, ১৮০০-১৯০০

অন্যদিকে একই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের ফলে অন্যান্য দেশি-বিদেশি বণিক স্বার্থ অনেকাংশেই খর্ব হয়। অশোক সেন দেখাচ্ছেন,

> ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে দুর্বল, অর্থাভাবে জর্জরিত মোগল বাদশাহ বার্ষিক তিন হাজার টাকা প্রাপ্তির কড়ারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা সুবায় বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে ফরমান জারি করেন। তৎকালীন বাংলার সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁ এতে আপত্তি জানালেও কোন ফল হয়নি। সিরাজদ্দউলার ইংরেজ বিরোধিতার একটা কারণ নিশ্চয় সেখানে নিহিত ছিল। কোন নবাবই এই ব্যবস্থাকে পছন্দ করেননি। মীরকাশিমের আমলে তো বিরোধ তুঙ্গে ওঠে।[১]

অশোক সেন এরপর বিস্তারিত আলোচনা করে দেখান, কিভাবে পলাশী আর বকসার দুটি যুদ্ধ আসলে ব্রিটিশ কোম্পানির এদেশে আধিপত্য বিস্তারের দুটি বড় সোপান হয়ে ওঠে এবং ১৭৬৫ তে বাদশাহ শাহ আলম কোম্পানিকে বাংলা সুবার দেওয়ানি অর্পণ করলে কোম্পানি রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার পথে অনেকটাই এগিয়ে যায়। দেওয়ানি পেয়ে তাড়াতাড়ি বেশি লাভের দিকেই কোম্পানি নজর দেয়। মুর্শিদাবাদে নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হলেন মহম্মদ রেজা খাঁ, বাংলার দায়িত্ব তাঁর; পাটনায় নিযুক্ত হলেন সিতাব রায়, বিহারের দায়িত্বে। ১৭৬৯-৭০ ছিল খরার বছর। তদুপরি চড়া হারে খাজনা আদায়ের অনমনীয় কঠোরতায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) প্রকোপে এক-তৃতীয়াংশ দেশবাসীর মৃত্যু ঘটে। আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণে কিন্তু কোন ঘাটতি হয়নি।

এক বা অল্প কয়েক বছরের জন্য জমি ইজারা দিলে কৃষকের সাধ্য, জমি ও কৃষিকর্মের হালবেহাল ইত্যাদি কোন বিবেচনা রাজস্ব তথা তার উৎস প্রজাদের দেয় খাজনার নির্ধারণে

১। অলোক রায় ও গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাংলা*, কলকাতা : পারুল, ২০১৩।

স্থান পায় না। জমি বা কৃষকের ভালোমন্দকে পাত্তা না দিয়ে স্বল্পস্থায়ী ইজারাদাররা বেশি বেশি খাজনা আদায় করতেই ব্যস্ত হতেন। বেনিয়ান, মুৎসুদ্দিজাতীয় ব্যবসায়ীদের অনেকে এমন ইজারাদার থেকে জমিদার হয়েছিলেন ফলে ১৭৮৯ নাগাদ জমিদার শ্রেণীর চেহারা পালটাতে শুরু করে।

১৭৭২-এ দেওয়ানি ও নিজামত এক করে বাংলা প্রেসিডেন্সির শাসনভার নিলেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। বলা হয় ব্রিটিশ কোম্পানি আদৌ সেই সময়ে ভারতবর্ষ শাসন করার কথা ভাবেনি, তারা ছিল বণিক সম্প্রদায়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পরে যে প্রচুর উৎপাদিত সামগ্রী তা আমদানি- রপ্তানি করার মাধ্যমে বাণিজ্যিক মুনাফা লোটাই ছিল এদের প্রধান কর্মসূচি।

> এদেশে রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহারের সুযোগ এলে প্রথম এক দশক বা তার কিছু বেশি সময় ওই রকম মুনাফা এবং তার অতিরিক্ত জোরজুলুম লুটপাটেই কেটে গেল। তার পরম্পরায় রাষ্ট্রশক্তিতে আধিপত্য কায়েম হলে কিন্তু অন্যরকম চিন্তারও প্রয়োজন হয়।[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) পরে ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনপ্রক্রিয়া আরও মজবুত হল এবং এই প্রক্রিয়াকে সুগম করল বণিক কোম্পানির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নজরদারি স্বরূপ নিয়ামক আইন (Regulating Act, 1773) এবং পিটস ইন্ডিয়া আইন (Pitt's India Act, 1784)। এই বিষয়ে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গ্রামবাংলা : উনিশ শতক' প্রবন্ধে বলছেন —

> ব্রিটিশ ভূমি-ব্যবস্থার অভিঘাতে বাংলা তথা ভারতের গ্রামসমাজ যে নানাভাবে ভেঙ্গেচুরে বদলে যাচ্ছিল, সে কথাও সমানভাবে সত্য।

---

১ বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০'

> বাংলায় এই পরিবর্তনের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে উনিশ শতকেই; কারণ আঠারো শতকের একেবারে শেষ পর্বে (১৭৯৩) ব্রিটিশ ভূমিনীতি জমিদারদের সঙ্গেই একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেওয়াটা সাব্যস্ত করে; এই নতুন ব্যবস্থার প্রভাব গ্রামের ওপর পড়তে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই।[২]

তাই গ্রাম-বাংলার জীবনে উনিশ শতককে যদি আমরা রূপান্তরের পর্ব বলে চিহ্নিত করি, খুব ভুল হবে না। অশোক সেনের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি এক বিশেষ শ্রেণীর কথা যারা মূলত আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। এরা বেশিরভাগই বংশানুক্রমে জমিদার নয় কিন্তু কোম্পানির নতুন শাসন ব্যবস্থায় এঁরা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে থাকে এবং কোম্পানির কাছ থেকেও প্রতিদান স্বরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং দেশীয় জমির মালিকানা গ্রহণে ধীরে ধীরে কিছু ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের কথাই আমরা বলতে পারি, আঠারো শতকের মধ্যেই দেখা যায়, বর্ধিষ্ণু শহর কলকাতায় যে নতুন নাগরিক অভিজাতশ্রেণীর (urban aristocracy) বিকাশ হয়, তার মধ্যে – অর্থাৎ এই অভিজাতদের আদি- প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে প্রাচীন বংশগত মর্যাদা বিশেষ কেউ দাবী করতে পারেন না। কলকাতা শহরের নব্য-অভিজাতশ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা যারা (family founders' বলা যায়) বংশপরিচয়ের দিক থেকে তাঁদের অজ্ঞাতকুলশীল বললেও অত্যুক্তি হয় না। শোভাবাজারের রাজপরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার, সিমলার দে-সরকার-পরিবার, পাইকপাড়ার সিংহ পরিবার প্রভৃতি কলকাতার উচ্চশ্রেণীর পরিবার- প্রতিষ্ঠাতাদের পূর্বপুরুষরা অধিকাংশই প্রায় অখ্যাত ও অজ্ঞাত। পরবর্তীকালে এরাই হয়ে ওঠে যাবতীয় সুযোগ

২। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রামবাংলাঃ উনিশ শতক' বসু, স্বপন, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২৯ শে মে ২০১৫,পৃষ্ঠাঃ ৫৫

সুবিধাভোগী এক বিশেষ শ্রেণী, এঁরা মধ্যবিত্ত। ঐতিহাসিক A.F.Pollard , '*Factors in Modern History*, 3rd ed.London 1932, এ বলেন —

> …… feudalism contemplated, roughly only two classes, the lords and their villeins. Now, the industrial and commercial system of modern history requires two factors which feudalism did not provide;it requires a middle class and it requires an urban population. Without these two there would have been little to distinguish between modern from medieval history. Without commerce and industry there can be no middle class; where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation.[১]

এই মত সমর্থন করে বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণী' প্রবন্ধে বলেন, ইংলন্ডের মত বাংলাদেশের ইতিহাসও প্রধানত মধ্যবিত্তের হাতে গড়া। আমরা আধুনিক ইতিহাসের কথা বলছি, বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলের নতুন ইতিহাসের ধারার কথা।

বিনয় ঘোষের লেখা থেকেই জানা যায় ১৮২৯ সালে 'বঙ্গদুত' পত্রিকা প্রথম শ্রেণী হিসেবে বাঙালি মধ্যবিত্তের কথা তুলছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রায় আশি বছরের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেক জমিদারিতে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৮৭২-৭৩ সালে জমিদারির সংখ্যা হয়েছিল দেড়লক্ষের বেশি, আর তার মধ্যে পাঁচশ একরের ছোট জমিদারির সংখ্যা তেরলক্ষের বেশি। এটি ছিল গ্রাম্য মধ্যবিত্তের চেহারা।

> বাংলাদেশের আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেনীর বিকাশ হয়েছে প্রধানত কলকাতা শহরের আর্থিক কর্মজীবন কেন্দ্র করে।

১। A.F.Pollard , 'Factors in Modern History, 3rd ed.London 1932,Ch3 pp.43-44

> কলকাতার আর্থিক কর্মজীবন শিল্পকেন্দ্রিক ছিল না, বাণিজ্য ও প্রশাসনকেন্দ্রিক ছিল।[২]

এই হল ইংরেজিশিক্ষার প্রথম পর্বের চাকরিজীবী বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্তের ছবি। হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত (১৮১৭-৫৭) ইংরেজিশিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব বলা যায়। এই সময়ের মধ্যে হিন্দুকলেজ ছাড়াও ১৮৩৫ সালে মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী ইংরেজি ভাষা সরকার-অনুমোদিত আধুনিক শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয়। ইংরেজিশিক্ষার আগ্রহও বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে দ্রুত বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার বহুল বিস্তার ঘটে মূলত ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর। ১৮৩০ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৩৬, এবং ১৮১৭ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে ১৩ বছরে, অন্তত ১০০০/১২০০ ছাত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে ধরা যেতে পারে। ১৮৩৫ সালে বেন্টিঙ্ক-মেকলের উদ্যোগে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সরকারীনীতি হিসেবে গৃহীত হওয়ার আগেই দেখা যায়, বাংলাদেশে আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাথমিক বিকাশ হয়েছিল।

H.J.S Cotton: *India in Transition* : London 1885 p. 15 –তে বলেন,

> The educated classes are the voice and brain of the country. The Bengalee Baboos now rule public opinion from Peshawur to Chittagong….. [১]

২। বিনয় ঘোষ, ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা’, ১৮০০-১৯০০

১। H.J.S Cotton: ‘India in Transition’:London 1885 p. 15

১৮৩৫ সালে মেকলের তৈরি করা শিক্ষানীতির উদ্দেশ্যই ছিল, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এমন এক বাঙালি সম্প্রদায় তৈরি করা

> who may be interpreters between us and the millions whom we govern- a class of persons Indian in colour and blood , but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect.[২]

ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালি বাবু সম্প্রদায়ের এটি ছিল একটি নিতান্তই ছোট ইতিহাস। বলা বাহুল্য বাঙালি পুরুষ যেভাবে শিক্ষা, মর্যাদা, সামাজিক চেতনা লাভ করেছে, উনিশ শতকের নারীর সামাজিক বিকাশ সে পথে হয়নি। হওয়ার ক্ষেত্রটিও তো প্রস্তুত ছিল না। নারীশিক্ষা, নারীপ্রগতি নিয়ে কথা বলার আগে তাই প্রাক-আধুনিকে নারীর অবস্থানটি স্বল্প পরিসরে জানা প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে বেশ কিছু মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার পরিচয় পাই ইতিহাস বইগুলিতে। শ্রমবিভাজন হওয়ার পর থেকেই পুরুষ-নারীর কর্মক্ষেত্র ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। উত্তরা চক্রবর্তী তাঁর 'নারীপ্রগতির নিখিলভুবন' প্রবন্ধে বলছেন,

> পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, যা সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত, সেখানে নারী বরাবরই পুরুষের অধীন, বাধ্য এবং অনুগত। .....কখনও কখনও নারীর অস্তিত্বের পরিবর্তন লক্ষনীয়।[১]

এর একটা বড় কারণ ইসলামের আগমন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাস্থাপন। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে এক অভিনব চঞ্চল তরঙ্গময়তা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণও ইসলামের অভিঘাত। লৌকিক ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে নারীতন্ত্রের বিশেষ ভূমিকা পাই। এমনকি আট এবং নয় শতকে

২। Ibid

১। উত্তরা চক্রবর্তী , 'নারীপ্রগতির নিখিলভুবন', অলোক রায়, গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাংলা,* কলকাতা : পারুল, ২০১৩, পৃষ্ঠাঃ ১৮৪-২১২

উত্তরভারত থেকে প্রায় বিলুপ্ত বৌদ্ধধর্ম বাংলা এবং বিহারের প্রান্তে বেশ কিছুকাল ছিল, খ্রিস্টপূর্বাব্দের বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের সংগৃহীত থেরিগাথাতে নারীর দৃঢ় স্বর শোনা যায়,

কত মুক্ত আমি,কী উজ্জ্বল মহিমময় মুক্তি
আমার-
আমার মশলা পেষার জাঁতা, আমার রান্নাঘরের
আমার তৈজস,
আর আমার কুঁজো- পিঠের স্বামী,
তুচ্ছ, প্রত্যহের গ্লানি ও নিষ্পেষণ
যা আমাকে ধরে রেখেছিল,চেপে রেখেছিল
সব ছেড়ে আমি চলে এসেছি-[১]

বাংলার যোগীধর্মের যোগিনীদের কণ্ঠেও এই স্বাধীনতার স্বর পাই। তারাও পাঠাভ্যাস করত, মন্ত্র-তন্ত্র-সাধনায় সক্রিয় ভূমিকা নিত। বাংলা, উড়িষ্যা, আসামে 'হাঠেয়ারা' দের কথা পাই, এরা শিক্ষিত। মধ্যযুগের বাংলায় পাই বিদগ্ধ স্ত্রী নামে মুক্ত, স্বাধীন, শিক্ষিত নারীদের কথা। কবি জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী, এবং লক্ষণসেনের রাজসভার নর্তকী মাধবী এই নামে পরিচিত ছিল।

> জয়দেব নিজেকে উল্লেখ করতেন 'পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তী'। হয়ত সেই কারণে মানভঞ্জনের কৃষ্ণের মুখে 'দেহি পদপল্লব মুদারম' পদটি বসাতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। [২]

১। Chapla Verma, 'The Wildering Gloom,' Women's Place in Buddhist History, Mandakranta Bose ed.Faces of the Feminine, Oxford, 2000 p.83, অনুবাদ : উত্তরা চক্রবর্তী।

২। উত্তরা চক্রবর্তী , 'নারীপ্রগতির নিখিলভুবন', অলোক রায়, গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাংলা,* কলকাতা : পারুল, ২০১৩, পৃষ্ঠা : ১৮৪-২১২

এছাড়াও মধ্যযুগের শিক্ষিত আরেক নারী, ওড্র-র রাজা ইন্দ্রভূতির বোন লক্ষীকরার প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। তবে এই সকল নারীদের দেখে সামগ্রিক নারীদের বিচার করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে এঁরা ছিলেন ব্যতিক্রম। তবে এর পাশাপাশি আর একটি কথা যা খেয়াল রাখা উচিৎ, বিদ্যাশিক্ষা সব পুরুষদের কাজ ছিল এমন ভাবনাও ঠিক নয়। প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যাশিক্ষার অধিকার ছিল উচ্চশ্রেণীর এবং উচ্চবর্ণের পুরুষের। উনিশ শতকে এসেও এই কথাটি অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শনে', "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে স্পষ্টই বলছেন, 'হাসিম শেখ', 'রামা কৈবর্ত'- দের কথা। বলছেন চারিদিকে এত যে মঙ্গলের ছড়াছড়ি, মঙ্গল আসলে কার? যাদের মঙ্গল তারা তো দেশ নয়, উল্টোদিকে যারা মঙ্গলের ছোঁয়া পায় না, যারা হাজার জনের মধ্যে নশো নিরানব্বই জন, তারা আসলে দেশ। কিন্তু শিক্ষা তো তাদের জন্য নয়। মঙ্গল তো ওই এক জনেরই। শাশ্বত ভট্টাচার্যের 'উনিশ শতকঃ বাংলা নতুন সাহিত্যের শুরু' –র সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে পারি,

> অক্ষর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট উঁচু খাড়া দেয়ালের মত, যেন এক দুর্লঙ্ঘ্য বিভাজন রেখা, যার দু-ধারে ছড়ানো দুই পৃথক সাংস্কৃতিক উৎপাদনক্ষেত্র। [১]

প্রায় একই সুর উত্তরা চক্রবর্তীর লেখায়-ও। বাংলার মুসলমান সমাজ বিভাজিত ছিল সম্ভ্রান্ত অভিজাত এবং সাধারণ শ্রমজীবী এই দুই শ্রেণীতে। সেখানে নিম্নবর্গের মেয়েরা চাষের ক্ষেতে কাজ করত, বাজারে স্বচ্ছন্দে চলাফেরাতেও তাদের বিধিনিষেধ ছিল না। নিম্নবর্ণের পুরুষদের মত তারাও স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা, আধুনিকতার অধিকারী ছিল না বলাই বাহুল্য। আঠারো শতকের শেষাশেষি এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এমন সব মেয়েদের স্বতন্ত্র

১। শাশ্বত ভট্টাচার্য, 'উনিশ শতকঃবাংলা নতুন সাহিত্যের শুরু', অলোক রায়, গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাংলা,* কলকাতা : পারুল, ২০১৩, পৃষ্ঠাঃ ২১৩-২২৭

অস্তিত্বের কাহিনী খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন ভাবে জানা যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই দেখব আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের শুরুতে যখন বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভিতটি ক্রমশ বদলে যাচ্ছে এবং দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি, মিশ্র রুচির অভিক্ষেপ ঘটছে, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এই বিচিত্র, বর্ণময় পরিবর্তনে নারীর ভূমিকা এবং অবস্থানটিও বিশিষ্টতা পেয়েছিল।

মধ্যযুগের শেষে যে নারীদের আমরা স্বাধীন, বৃত্তিজীবী দেখি তাদের বেশিরভাগই তো সংসারে আবদ্ধ নয়। উত্তরা চক্রবর্তী দেখান,

> দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় যে রমণী একাকী, সে তো গৃহস্থ নারী নয়, উপরন্তু তার একাকী বসবাস, একাকী চলাফেরা সন্দেহজনক। শিক্ষাদানের বিনিময়ে যে যৎসামান্য উপার্জনে স্বনির্ভর বৈষ্ণবী, গৃহস্থের পারিবারিক সীমানার অসম্মানিত প্রান্তে সে পর্যবসিত।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অন্তঃপুরস্থ মেয়েদের অবস্থার অবনতি অনেকের বর্ণনা থেকেই জানা যায়।মধ্যযুগে মেয়েদের ঘরে বন্দী করে রাখার রীতিটি উনিশ শতকে এসে পরিচিত হয় অবরোধ প্রথা হিসেবে। প্রিসিলা চ্যাপম্যান এই অন্তঃপুরের একটি বর্ণনা দেন —

> The apartments for the women, dominated by "the Zenanah" are studiously secluded;the gratings or shutters with small air holes,serving not simply as a protection from the heat,but rather as a prison security,through which none can penetrate,to search into the sad scenes of misery resulting from the pervertion of heaven's greatest blessing.[২]

১। উত্তরা চক্রবর্তী , 'নারীপ্রগতির নিখিলভুবন' অলোক রায়, গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাংলা,* কলকাতা : পারুল, ২০১৩, পৃষ্ঠাঃ ১৮৪-২১২

২। Priscilla Chapman, 'Hindoo Female Education', London: 1839.p.3

সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী তাঁর 'অন্দরে অন্তরে'- তে বলছেন, পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি পরিবারে মহিলাদের কোন মর্যাদা ছিল না, তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্যও ছিল না সংসারে, তাই জন্যই বংশের মর্যাদা রাখার জন্য কখনো তাঁর বিয়ে হত আশি বছরের বৃদ্ধর সাথে আবার কখনো বা যেতে হত সহমরণে। চার্লস গ্রান্ট তাঁর লেখায় বাঙালি পরিবারের স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের সাথে তুলনা করেছেন। প্রায় একই রকম মন্তব্য করেন অকল্যান্ডওঃ

> The men here are a sadly idle set; they make almost slaves of their wives.[১]

এমনকি কেরীর 'কথোপকথন' (১৮০১) থেকেও স্বামীর স্ত্রীকে গালাগালি তিরস্কারের কথা জানা যায়। ১৮১৯-এ রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা রদ করার প্রসঙ্গে প্রকাশিত দ্বিতীয় বইয়ে তিনি মন্তব্য করেন মেয়েরা প্রধানত রাঁধুনি, শয্যাসঙ্গিনী এবং বিশ্বস্ত পরিচারিকা।

উনিশ শতকের বাংলায় নারীশিক্ষার ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারীরা। রবার্ট মে নামক এক খ্রিস্টান মিশনারী এখানে প্রথম মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮১৮ সালে এঁর মৃত্যুর পরে সাময়িকভাবে এই প্রয়াসে কিছুটা বাধা পড়ে, যদিও ততদিনে অন্যান্য খ্রিস্টান মিশনারীরা নারীশিক্ষা নিয়ে অনেকটাই তৎপর হয়ে উঠেছে।এরপর ১৮১৯ এ 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' স্থাপিত হলে ধীরে ধীরে নন্দনবাগান, গৌরীবাড়ি, জানবাজার, চিৎপুর প্রভৃতি স্থানে চারটি স্কুল খোলে। এছাড়াও এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে মিস মেরি অ্যান কুকের ভুমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রয়াস নিতান্তই উদ্দ্যেশ্যপ্রণোদিত ছিল। শিক্ষার আড়ালে ধর্মপ্রচার করাই ছিল এদের আসল উদ্দ্যেশ্য।এদের স্কুলগুলোতে বাইবেল অবশ্যপাঠ্য হওয়ায় সাধারণ মানুষের মনে এদের সম্পর্কে

১। Rev.T.Acland, 'A Popular Account of the Manners and Customs of India', (London,1847),p.20

ভালো ধারণা ছিল না। ফলে এই প্রচেষ্টাও কার্যকর হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার রূপরেখাটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদে আলোচিত হয়েছে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে যে মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষিত হচ্ছে, তা পাই 'সমাচার দর্পণ'-এ —

> ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন। এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন।[১]

১৮৮০ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর *আধ্যাত্মিকা* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, তাঁর ঠাকুরমা, মা-কাকীরা বাংলা বই পড়তেন এবং বাংলা লিখতে ও হিসেব রাখতে জানতেন। তবে স্ত্রীশিক্ষার সামগ্রিক ছবি এটি নয়।বিশেষ কিছু ধনী এবং মধ্যবিত্ত বাড়িতেই মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হত, কৈলাসবাসিনী দেবীও একথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের চোখে স্ত্রীশিক্ষা ভালো ছিল না। ১৮৩৫ সালে অ্যাডাম দেখান স্ত্রীশিক্ষাকে অপরাধ হিসেবে দেখান হত এবং লেখাপড়া জানা মেয়েদের কেউ বিয়ে করতে চাইত না। কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছিলেন,

> তৎকালীন পণ্ডিতগণ কহিতেন যে সংস্কৃত শাস্ত্রে অবলা জাতির অধিকার নাই,আর স্ত্রীগণ গৃহমধ্যে কালীর অঙ্কপাত করিলে লক্ষী ত্যাগ হয়। স্ত্রীগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিলে অকালে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়।[২]

সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে যত সমাজ সংস্কার আন্দোলন হয়েছে তার অনেকগুলির কেন্দ্রেই নারীরা। সতীদাহ, কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, বিধবাবিবাহ, সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি তার প্রমাণ। নতুন সময়ের শিক্ষা, দর্শন নেওয়া উনিশ শতকের বর্ণহিন্দু বাঙালি

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত , *সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড,* কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৌষ ১৪০৮, পৃষ্ঠাঃ ১৩

২। *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি,* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত , সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৌষ ১৪০৮, পৃষ্ঠাঃ ৭

পুরুষ মেয়েদের এই বন্দীদশাকে মানতে চায়নি। যদিও এইসব প্রথার সমর্থনে কথা বলার লোকেরও অভাব ছিল না, তাই জন্যই রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত প্রত্যেকেই লিখেছিলেন একের পর এক বিতর্ক বিষয়ক বই যেখানে তাঁরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে দেখান মেয়েদের অধিকারের দিকগুলি। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে।

সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন সেই সময়ে বাড়ির বউকে প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে পাঠানোর ক্ষেত্রে আপত্তি ছিল। এই অবস্থায় মেয়েদের শিক্ষার বিকল্প যে পদ্ধতি শুরু হল, তা 'অন্তঃপুর শিক্ষা'। আর এই প্রকল্পকে বিকশিত করার উদ্দ্যেশ্যে প্রকাশিত হতে থাকে মহিলাদের জন্য বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা। মেয়েদের জন্য প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলি উনিশ শতাব্দীর স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও প্রসারের একটা প্রকল্প। বাড়ির বউ বাড়িতে বসেই লেখাপড়া শিখবে এবং একইসঙ্গে পরিবারের দায়িত্ব সামলাবে এই ছিল অভিপ্রায়। এবং এই শিক্ষিত বউয়ের চরিত্র কেমন হবে, চেতনা কতখানি জাগ্রত হবে এই সবই লেখা থাকত এই পত্রিকাগুলোতে। কখনো বা কেউ লিখতেন চিঠি,একান্তই ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। বাল্যবিবাহ,বৈধব্যের যন্ত্রণা এসব বিষয়েও 'শিক্ষিতা' মহিলারা ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিলেন। সবচেয়ে বেশী থাকত 'পরিবার' গড়ে তোলার পরামর্শ,শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য, এমনকি বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডনও।সব মিলিয়ে বলা যায় আসলে বাঙালি সমাজ অন্দরকে কিভাবে দেখতে চাইত তারই প্রামাণ্য দলিল এই পত্রিকাগুলি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অর্থাৎ ১৮৫০ এর আগে পর্যন্ত মহিলাদের জন্য আলাদা করে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। অথচ উনিশ শতকের একেবারে শুরুর দিক থেকেই বাঙালি সমাজে ছোটবড় নানান পত্র-পত্রিকা উপস্থিত ছিল। 'সংবাদ- সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের

বাঙালি সমাজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় স্বপন বসু বলছেন, সমকালের বিশ্বস্ত দর্পণ সংবাদ-সাময়িকপত্র। সমকালের যে ছবি এর পৃষ্ঠায় ফুটে ওঠে তা নিখুঁত অথবা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য কি না তা নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে। তবু ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে এর গুরুত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের আত্মপ্রকাশ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালিসমাজে তা সাদরে গৃহীত হয়। অল্পদিনের মধ্যে তা প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে এবং জনমত গঠনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। শহর কলকাতা এবং তার আশেপাশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে একের পর এক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। ঠিক কতগুলি পত্রিকা ১৮১৮-১৯০০ এই সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল,তা বলা কঠিন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িকপত্র' গ্রন্থের দু-খণ্ডে উনিশ শতকে প্রকাশিত ১০৪৬ টি পত্রিকার নাম উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী অনুসন্ধানে আমরা এইকালে প্রকাশিত আরও দেড় শতাধিক (এর মধ্যে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক- সব ধরনের পত্রিকাই আছে) সন্ধান পেয়েছি। এইসব পত্রিকাগুলির বিষয়বস্তুর ভিন্নতা লক্ষ্য করার মত। নানান সামাজিক বিষয়, যেমন- জমিদার, নীলকর, প্রজাদের দুর্দশা, পুলিশের কীর্তি, কৃষক বিদ্রোহ, বিদেশী শক্তির কাছে দায়বদ্ধতা, আধুনিক শিক্ষা, পরিবার, সমাজ, ধর্ম, নারী, সমাজ সংস্কার আন্দোলনের নানা দিক, ইংরেজি শিক্ষার স্বরূপ এবং এর পাশাপাশি সাহিত্য রচনাও উঠে এসেছে এই সব পত্র-পত্রিকায়। (*'সংবাদ- সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ', প্রথম খণ্ড*, স্বপন বসু, দ্রষ্টব্য)।

মেয়েদের বিষয়ে নানা লেখালেখিও হত এই সব পত্র-পত্রিকায়। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় –

১৮৬৬ সালে, 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' কৌলীন্যপ্রথা সম্পর্কে, ১৮৬৮ সালে 'সোমপ্রকাশ' কৌলীন্যের কুফল, ১৮৭৬ এ 'এডুকেশন গেজেট' বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে, ১৮৭৭ এ 'সাধারণী' কায়স্থকন্যার বিবাহ সমস্যা এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া', 'সমাচার দর্পণ', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্বর', 'বেঙ্গল হরকরা', ' হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সুলভ সমাচার', 'ঢাকা প্রকাশ', 'ব্রাহ্ম পাবলিক অপিনিয়ন', 'বঙ্গবন্ধু' নানা সময়ে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করছে। (দ্রষ্টব্যঃ দ্বিতীয় অধ্যায়)।

১৮৫০ এর পর, বিশেষ করে ১৮৬৯ থেকে আমরা বহু পত্রিকার নাম পাবো যেগুলি প্রধানত মেয়েদের জন্য প্রকাশিত হত। কোনটি আবার মহিলারাই সম্পাদনা করতেন। কালানুক্রমিকভাবে পত্রিকাগুলির পরিচয় নেওয়া যাক-

- মাসিক পত্রিকা :

প্রকাশকাল : ১৮৫৪ সালের ১৬ই আগস্ট প্রথম প্রকাশিত হয়, চার বছর চলেছিল।

সম্পাদনা : এর সম্পাদক ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর দুই বিখ্যাত মানুষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার।

ভূমিকা : 'মাসিক পত্রিকা'তে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত ভূমিকা,

> এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।[১]

এর আগে কোন মাসিক পত্রিকায় এমন নির্দিষ্ট করে মেয়েদের জন্য পত্রিকা বলা হয়নি।

- বামাবোধিনী পত্রিকা :

প্রকাশকাল : ১২৭০ এর ভাদ্র (আগস্ট, ১৮৬৩), পত্রিকাটি চলেছিল ১৩২৯ পর্যন্ত।

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক-পত্র, ২য় খণ্ড, ১২২৫-১৩০৭, কলকাতাঃ করুণা, ২০০৩, পৃষ্ঠাঃ ৫-৮২

সম্পাদনা : বিভিন্ন সময়ে নানা মানুষ এর সম্পাদনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শ্রীসুকুমার দত্ত, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, কুমারী ঊষাপ্রভা দত্ত, শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত, শ্রীদেবকুমার দত্ত প্রমুখ।

ভূমিকা : এই পত্রিকার 'উপক্রমণিকা' অংশে লেখা হয়,

> এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদায় বিষয় লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।.....বামাগণের বোধসুলভ জন্য বামাবোধিনীর বিষয়গুলো যত কোমল ও সরল সাধুভাষায় লেখা যায় আমরা তাহার চেষ্টার ত্রুটি করিব না।[১]

- অবলাবান্ধব : (পাক্ষিক)

প্রকাশকাল : ১২৭৬ সাল থেকে প্রকাশিত হয়, মাঝে অর্থাভাবে বন্ধ হয়, ১২৮৬ সালে আবার প্রকাশিত হলেও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

সম্পাদনা : দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা : পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল,

> সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করা।[২]

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক-পত্র, ২য় খণ্ড, ১২২৫-১৩০৭, কলকাতাঃ করুণা, ২০০৩, পৃষ্ঠাঃ ৫-৮২

২। তদেব

- জ্যোতিরিঙ্গণ :

  প্রকাশকাল : জুলাই, ১৮৬৯।

  সম্পাদনা : রেভারেন্ড এস সি ঘোষ।

  ভূমিকা :

  বালকবালিকা ও স্ত্রীগণের এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত।[১]

- নারীশিক্ষা পত্রিকা :

  প্রকাশকাল : ১ কার্ত্তিক, ১২৭৭।

  ভূমিকা : স্ত্রীলোকদের শিক্ষার উপযোগী করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য।

- বালারঞ্জিকা :

  প্রকাশকাল : বৈশাখ ১২৮০

  বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্র থেকে প্রকাশিত এক পয়সা মূল্যে প্রচারিত। স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা।

- হেমলতা :

  প্রকাশকাল : ১লা কার্ত্তিক, ১২৮০

  সম্পাদনা : মহেন্দ্রনাথ ঘোষ

  ভূমিকা :

  দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে লিখিতে উৎসাহ করা ইহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।[২]

১। তদেব

২। তদেব

- বিনোদিনী :

  প্রকাশকাল : বৈশাখ ১২৮২

  সম্পাদনা : ভুবনমোহিনী দেবী।

- বঙ্গমহিলা :

  প্রকাশকাল : বৈশাখ ১২৮২।

  সম্পাদক : ভুবনমোহন সরকার

  ভূমিকা :

  > বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নীতিগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সকল উপহার দেওয়া।[১]

- অনাথিনী :

  প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১২৮২

  সম্পাদনা : থাকমনি দেবী। এটি মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা।

- ভারতী :

  প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১২৮৪। পত্রিকাটি দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল ১৩৩০ পর্যন্ত।

  সম্পাদনা : ভারতীর প্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এরপর বিভিন্ন সময়ে, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ এর সম্পাদনা করেছেন।

১। তদেব

ভূমিকা : একাধিক মহিলা সম্পাদক দ্বারা সফলভাবে প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি। ততকালীন শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা সম্ভারে ভরা থাকত ভারতীর পাতা।

- হিন্দুললনা :

  প্রকাশকাল : মাঘ ১২৮৪

  মহিলা সম্পাদিত দ্বিতীয় পাক্ষিক পত্রিকা।

- পরিচারিকা :

  প্রকাশকাল : ১লা জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫, ২৮ বছর প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়। ১৩২৩ সালে পত্রিকাটি নতুনভাবে প্রকাশিত হয়।

  সম্পাদনা : প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মোহিনী দেবী, সুচারু দেবী, নিরুপমা দেবী।

  ভূমিকা : পত্রিকাটি ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত একটি উচ্চাঙ্গের স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন এর নিয়মিত লেখক।

- খ্রিষ্টীয় মহিলা :

  প্রকাশকাল : মাঘ ১২৮৭

  সম্পাদনা : কুমারী কামিনী শীল

  ভূমিকা : এতে শুধু মেয়েদের লেখাই ছাপা হত।

- সখা :

  প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৮৮৩

  সম্পাদনা : প্রমদাচরণ সেন

ভূমিকা : বালক-বালিকা পাঠ্য সচিত্র পত্রিকা।

- বালিকা :

  প্রকাশকাল : ভাদ্র ১২৯০

  সম্পাদনা : অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

  ভূমিকা : ঢাকা থেকে প্রকাশিত বালিকা পাঠ্য পত্রিকা।

- বঙ্গবাসিনী : (সাপ্তাহিক)

  প্রকাশকাল : কার্ত্তিক ১২৯০

  সম্পাদনা : গিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষ

  ভূমিকা : বঙ্গমহিলা পরিচালিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। কলকাতার টালা অঞ্চল থেকে প্রকাশিত, লেখিকা বা সম্পাদিকার নাম প্রকাশ করা হত না।

- সোহাগিনী :

  প্রকাশকাল : বৈশাখ ১২৯১

  সম্পাদনা : কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে।

- বালক :

  প্রকাশকাল : বৈশাখ ১২৯২

  সম্পাদনা : জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

  ভূমিকা : এক বছর পরে ভারতীর সঙ্গে মিশে যায়।

- বিরহিনী :

  প্রকাশকাল : কার্ত্তিক ১২৯৫

  সম্পাদনা : শৈলবালা দেবী।

  ভূমিকা : প্রধানত গল্পই প্রকাশিত হত।

- সাবিত্রী :

  প্রকাশকাল : মাঘ ১৩০৩

  সম্পাদনা : রামযাদব বাগচী, সহ সম্পাদক ছিলেন যদুনাথ চক্রবর্তী।

  ভূমিকা : মুরারপুর, গয়া থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার উদ্দ্যেশ্য ছিল,

  "হিন্দুরমণীদিগকে সাবিত্রীর ন্যায় করাই"

- পুন্য :

  প্রকাশকাল : আশ্বিন ১৩০৪

  সম্পাদনা : প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

  ভূমিকা : পত্রিকার উদ্দ্যেশ্য ছিল,

  > এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থানলাভ করিবে।.....ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইবে।

- অন্তঃপুর :

  প্রকাশকাল : মাঘ ১৩০৪

সম্পাদনা : বনলতা দেবী(সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা), চতুর্থ বর্ষ থেকে অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে হেমন্তকুমারী চৌধুরী এবং কুমুদিনী মিত্র পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছেন।

ভূমিকা : পত্রিকাটি ছিল,

"কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত।"

এখন মনে প্রশ্ন জাগে, উনিশ শতকে ১৮১৮ থেকে এতগুলি পত্রিকা থাকা সত্বেও আলাদা করে মহিলাদের জন্য পত্রিকার প্রয়োজন কেন হল। পত্র- পত্রিকার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা স্বপন বসুর কথাটি মনে করতে পারি, পত্র-পত্রিকা আচমকা সৃষ্টি হয় না, সমকালের দাবী থাকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতার মত বিষয়গুলিকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করেছিল সেকালের বাঙালি সমাজ। তাছাড়াও ভাবা যেতে পারে, সেই সময় নারীর শিক্ষা, পাঠক্রম, গতিবিধি নিয়ে তর্কবিতর্কের অন্ত ছিল না, কিন্তু এই সবই হচ্ছিল পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। উনিশ শতকের শিক্ষিত নারী নিজেদের শিক্ষা নিয়ে কি ভাবছে, স্বধীনতার অর্থ বলতে কি বুঝছে, তা প্রকাশ করার জায়গা করে দিয়েছিল এই পত্র-পত্রিকাগুলি। এছাড়াও অন্তঃপুরস্থ শিক্ষা দেওয়ার দায়ভারও ছিল পত্রিকাগুলির উপর। তাই হয়ত আলাদা করে 'মহিলাদের' জন্য পত্রিকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কি লেখা হত এইসকল পত্র-পত্রিকায়,তার একটি বিবরণ দেওয়া যাক। -

মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের নানান উদ্দ্যেশ্যের কথা দেখলাম। পত্রিকাগুলি সাধারণত তাদের উদ্দ্যেশ্য থেকে বিচ্যুত হত না। বিশেষত

সমাজে নারী করুণ অবস্থায় কালযাপন করছে, তাকে জাগতে হবে, এই ধারণাই পত্রিকাগুলি পৌঁছে দিতে চাইত বাঙালির অন্দরে। নানান বিষয় নিয়ে এখানে লেখা হত, সব লেখার শিরোনামও থাকত না। নারী নির্যাতন, নারীকেন্দ্রিক আন্দোলন বিষয়ে আলোচনা হত, চিঠিপত্রও লিখত মেয়েরা। কয়েকটির শিরোনাম দেখলেই বোঝা যাবে লেখালেখির ধরণ।

প্রকাশ	পত্রিকার নাম	শিরোনাম	বিষয়
জুলাই ১৮৬৭	বামাবোধিনী	‘স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার’	মেয়েদের সম্পর্কে সমাজের মনোভাব
১৮৭০	বামাবোধিনী	‘হিন্দুবিধবা’	বিধবাদের করুণ অবস্থা
১২৮২	বিনোদিনী	‘ বর্তমান সমাজে বঙ্গাঙ্গনা’	বাঙ্গালি নারীর করুণ অবস্থা
১২৮৩	বিনোদিনী	‘নারী’	ঐ
১২৯৮	পরিচারিকা	‘শাশুড়ির অত্যাচার’	অভিজত পরিবারের অন্দরের বর্ণনা
১৮৬৮	বামাবোধিনী	‘বর্তমান হিন্দুরীতি ক্রমে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা উচিৎ হইয়াছে কিনা?’	বিধবাবিবাহের প্রতি মেয়েদের ধারণা
১২৯৭	পরিচারিকা	‘কৌলীন্য ও বহুবিবাহ’	কৌলীন্যের কুফল

এই ধরণের লেখা ছাড়াও পত্রিকাগুলিতে সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হত স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কথা। মেয়েদের জন্য কোথায় কোথায় স্কুল স্থাপন হচ্ছে, তার খবর, কখনো বা কোন লেখিকার প্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনাও প্রকাশিত হত।

প্রকাশ	পত্রিকা	বিষয়
১৮৬৫	বামাবোধিনী	খড়দা বালিকা বিদ্যালয়
১৮৬৫	ঐ	শ্রীখণ্ড ও জামানায় বালিকা বিদ্যালয়
১৮৬৬	ঐ	বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার বর্তমান অবস্থা
১৮৭৪	বালারঞ্জিকা	মুসলমান মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর প্রস্তাব
১২৮৩	বঙ্গমহিলা	মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতিদান
১৯০০	অন্তঃপুর	এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নারী
১৯০০	ঐ	লিলিয়ান পালিত সংবাদ
১২৮৫	অবলাবান্ধব	মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সমর্থন

নিতান্তই এই কেজো হিসেব কোথায় কটি বিদ্যালয় হল, কটি মহিলা ডাক্তার হলেন, অথবা বিদ্যালয়ের পাঠক্রমই বা কেমন হল, শুধু এইসব খবরাখবর দেওয়াতেই থেমে ছিল না পত্রিকাগুলি। স্ত্রীশিক্ষা কেমন হওয়া উচিৎ, শিক্ষিত মহিলার আচরণই বা কেমন হওয়া উচিৎ সেই সব নিয়েও নিজস্ব মতামত দিত পত্রিকাগুলি। আজও সেইসব মতামত পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে।

উনিশ শতকে মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার পাতা ওলটালে একটা প্রশ্ন মনে আসে, উনিশ শতকের 'শিক্ষিত', 'সমাজ-সচেতন' ব্যক্তিরা কতটা স্ত্রীশিক্ষা চেয়েছিলেন! সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংকলনে দেখি মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলির বিশেষ ধরনের নামের মিল। কয়েকটি শিরোনাম থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়— 'হিন্দুনারী', 'পতিব্রতা', 'সুগৃহিণী', 'নারীর কর্তব্য' প্রভৃতি। এই নাম গুলি বারবার ফিরে এসেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীরা বলতেন বিদ্যা গ্রহণে নারীর নারীত্ব নষ্ট হয়, সে ব্যভিচারিণী হয়, সংসারে মন থাকবে না ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্যঃ দ্বিতীয় অধ্যায়) তার উত্তরে পত্রিকাগুলি যেন যুক্তি দিচ্ছে,

বিদ্যাশিক্ষা হলে নারী হয়ে উঠবে 'আদর্শ', সে পরিবারের খেয়াল রাখতে শিখবে আরও ভালোভাবে। আমরা লক্ষ্য করব তর্ক হয়েছে স্ত্রী ও পুরুষের পাঠক্রম এক হবে কিনা তা নিয়েও। যারা শিক্ষার পক্ষপাতী তাঁরাও বলেছেন নারী ও পুরুষের প্রবৃত্তি, স্বভাব আলাদা, ফলে উভয়ের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থাই শ্রেয়। এখানে এসেই অদ্ভুৎ ভাবে মিলে যায় নারী শিক্ষার পক্ষের এবং বিরোধী শ্রেনীর মানুষ। স্ত্রীলোকের প্রধান কর্মক্ষেত্র পরিবার,তাই পরিবারের সুখ-শান্তির জন্য, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য এবং সন্তান লালন-পালনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাই মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা। '*বামাবোধিনী*' ছিল অপেক্ষাকৃত অগ্রণী অথচ সেও বলে,

> যতটুকু তাঁহাদের নিতান্ত আবশ্যক, সেইটুকু উপার্জন করিলেই হইল। অতি কঠিন ও কঠোর বিদ্যা সকল সাধনার্থে মস্তিষ্ক আলোড়ন করা স্ত্রী প্রকৃতির বিরুদ্ধ। [১]

এমনকি এরকম মন্তব্য পাই অতিরিক্ত শিক্ষা মেয়েদের শারীরিক ক্ষতি করে, তাঁরা বিধবা হয়। স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার এমনতর মাথাব্যথা দেখে আমরা সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীর 'অন্দরে অন্তরে'র সঙ্গে একমত প্রকাশ করি, তা হল 'স্ত্রীজনচিত শিক্ষা' আর এই শিক্ষা প্রচারের ম্যানিফেসটো হল মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলি। তবে শুধু এটুকুই নয়, উনিশ শতকের মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলির এই বিশেষ দেখার ধরন সরিয়ে রাখলে পাশাপাশি আরও স্বর শোনা যাবে। 'ভারতী' নামে পত্রিকাটি ঠাকুর পরিবার থেকে প্রকাশিত হত, তার কোন দায় ছিল না ধর্মযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার। এই বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদে

১। বামাবোধিনী, আশ্বিন ১২৮০, ভারতী রায় সংকলন ও সম্পাদনা, *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা,* কলকাতা : আনন্দ, ডিসেম্বর ২০১৪ , পৃষ্ঠাঃ ৬১

আলোচনা হয়েছে। এই বহুস্বরের মাঝেই নারীর শিক্ষা শুরু হল, শুরু হল তার সামাজিক গতিবিধির নির্ধারণ।

উনিশ শতকে বাঙালি হঠাৎ পশ্চিমের সভ্যতার আলো পেয়ে স্ত্রী-শিক্ষা, নারীমুক্তির হয়ে আন্দোলন করে উঠল কিম্বা হঠাৎ করে নারীর বন্দীদশায় তাঁরা দুঃখ পেয়ে স্ত্রী-শিক্ষার ব্রতী হলেন – বিষয়টি এত সরলরেখায় এগোয়নি। উনিশ শতকের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত, যোগ্য হলেও তাঁরা তখন পরাধীন জাতি। শাসনভার সেই সময় ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে, এক কথায় 'বাহির' টা নব্য বাঙালির আয়ত্বের বাইরে, এইসময় স্বাভাবিকভাবেই 'ঘর' তাদের কাছে অনেক বেশি কাঙ্খিত হয়। নতুন ভাবাদর্শে দীক্ষিত শিক্ষিত বাঙালির কাছে সেই সময় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' এমন ক্ষেত্রে মন্তব্য করছে,

> পরস্পর পরস্পরের আত্মার অভাব মোচনের উপায় সকল অন্বেষণ করিবেন, একসঙ্গে ধর্মানুষ্ঠান, একসঙ্গে শয়ন, একসঙ্গে ভোজন, একসঙ্গে অধ্যয়ন ইত্যাদি ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্তব্যসকল নিষ্পন্ন করিয়া আপনাদিগের সম্বন্ধের যথার্থ গৌরববৃদ্ধি করিবেন। [১]

এই প্রসঙ্গে সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী বলছেন,

> লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, দাম্পত্য সম্পর্কে পারস্পরিকতার মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিজৈবিক সমতার ওপরে। স্বামী ও স্ত্রীর যদি চিন্তাভাবনা ও জীবনদর্শনে প্রচুর ফারাক থাকে তাহলে দাম্পত্য জীবনে যেগুলিকে 'ইশ্বরাভিপ্রেত করতব্য'বলে মনে করা হত, সেগুলি নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এবং স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতার গঠনে পার্থক্য কোনদিনই ঘোচানো সম্ভব নয় যদি না স্ত্রী কিছুটা শিক্ষিত হয়।ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেমন এই

১। বামাবোধিনী, আশ্বিন ১২৮০, ভারতী রায় সংকলন ও সম্পাদনা, *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা,* কলকাতা : আনন্দ, ডিসেম্বর ২০১৪ , পৃষ্ঠাঃ ৫৭

> সত্যটি অনুভূত হয়েছিল যে যুগের স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদের কাছে, দ্বিতীয়ার্ধেও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সেটাই ছিল অন্যতম প্রধান যুক্তি। এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত ছিল মেয়েদের সার্বিক অবস্থার উন্নতির বাসনা। আশা করা হত, স্ত্রীজাতির অবস্থার সার্বিক উন্নতি হলে গোটা সমাজের পক্ষেই তা মঙ্গলজনক এবং স্ত্রীশিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কখনই অসচেতন ছিলেন নাঃ 'দ্বেষ, হিংসা, কলহ, দ্বন্দ, ক্রোধ, অহংকার, বিচ্ছেদ, আলস্য, মূর্খতা, এবং দুঃখ প্রভৃতির এদেশে এত আধিক্য শুদ্ধ স্ত্রীজাতির দোষেই কহিতে হইবেক,কারন আমরা যাহারদিগের উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহারা অহরহ কেবল দ্বেষ হিংশায় প্রমত্তা।...বিবেচনা করুন, যাঁহারা আমাদের প্রসব করেন ও লালন পালন করেন যখন তাহারাই এরূপ হইলেন তখন আমরা কত ভালো হইব? সুতরাং বিদ্যা দ্বারা তাঁহারদিগের ঐ কুসংস্কার বিনষ্ট হইলে অস্মৎ পক্ষে কত কুশল হওনের সম্ভাবনা। [২]

যদিও মেয়েদের শিক্ষার প্রণালীটি নিয়ে সে কালে কম বিতর্ক হয়নি। নানা মুনী নানা মত দিলেও এক বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত ছিলেন যে মেয়েদের শিক্ষা হবে পুরুষদের শিক্ষার চেয়ে আলাদা, কারণ তাঁদের মতে মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য আলাদা। তাঁরা শিক্ষিত হবে, পুরুষের মনের মধু জোগানোর জন্য, আরও ভালো ভাবে সন্তান পালনের জন্য, সংসারকে আরও মজবুত ভাবে চালানোর জন্য, সুতরাং মেয়েরা যাতে " এ বি শিখে/ বিবি সেজে" বাইরে না বেরয় সেইদিকে শিক্ষিত বাঙালি যথেষ্টই নজর রেখেছে, এবং শুরু করেছে *'সুশীলার উপাখ্যান'*।

এইসকল মেয়েদের পত্রিকাগুলির কিছু বিশেষত্ব ছিল। খবরাখবর প্রকাশেই কেবল থেমে ছিল না এরা। স্ত্রীশিক্ষা কেমন হওয়া উচিৎ, শিক্ষিত নারীর আচরণই বা কেমন হবে,

---

২। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে*, কলকাতা : স্ত্রী, ২০১০, পৃষ্ঠাঃ ৮৩

সেই বিষয়েও মত প্রকাশ করত পত্রিকাগুলি। যেমন 'পরিচারিকা' পত্রিকাটি মনে করত মেয়েদের ধর্মবিযুক্ত শিক্ষা দিলে চলবে না।

> স্ত্রী প্রকৃতির সঙগঠন ও সমুন্নতি সাধনই স্ত্রীশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকদিগকে শুদ্ধগনিত সাহিত্য ইতিহাস ভূগোলের বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক পড়াইলে তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষা হয় না। যে শিক্ষায় ধর্মের প্রাধান্য নাই সেই শিক্ষা বিষময় ফল প্রসব করে। কলেজের শিক্ষিত বি এ এম এ উপাধিধারী যুবকগণের ধর্ম ও নীতিহীন জীবন আমাদের একথার প্রমাণ। [১]

জানতে ইচ্ছে করে তাহলে কি কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করেন মেয়েরা বেশি শিক্ষিত হয়ে বিপথে যাবেন বা সত্যিই 'বিবি' সাজবেন, তাতে কার গৌরব ম্লান হবে কে জানে, হয়ত 'পুরুষ' বাবুদের।

বামাবোধিনী পত্রিকাতে *'নব্যবঙ্গমহিলা'* নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে ১২৭৯ ফাল্গুণ-এ,

> এ পরিবর্তনের স্রোত কোনদিকে চলিতেছে? সত্যই কি আমাদের দেশীয় ভগিনীরা বিবি হইতে চান?তাহা নহে। তাঁহারা কি হইতেছেন, কি হইবেন এখনও স্থির নাই। এই স্থির তাঁহারা পুরাতনের ন্যায় থাকিবেন না। এখন তাঁহারা ময়দার ঠাসার ন্যায় কাহার হাতে কি গড়ন পাইবেন ভবিষ্যতের কথা।[২]

আমরা শেষের লাইনটি লক্ষ্য করব। 'ময়দার ঠাসার ন্যায়' কারোর হাতে গড়ে উঠবে। অর্থাৎ মানেটা এই দাঁড়ায় এই বঙ্গমহিলারা যদিও লেখাপড়া শিখবেন, উপন্যাস,কবিতা লিখবেন, তবুও তাঁরা শিক্ষিত হয়ে কেমন হয়ে উঠবেন, তাঁরা কেমনভাবে পৃথিবীকে, তাঁদের

১। 'পরিচারিকা', *"প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা"*, মাঘ, ১২৮৭, স্বপন বসু, *সংবাদ- সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, অক্টোবর ২০০৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৩

২। বামাবোধিনী, ফাল্গুন ১২৭৯ , ভারতী রায় সংকলন ও সম্পাদনা, *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা,* কলকাতা : আনন্দ, ডিসেম্বর ২০১৪ , পৃষ্ঠাঃ ৫২

চারপাশকে দেখবেন বা সেই শিক্ষা নিয়ে কি করবেন সে সিদ্ধান্ত তাঁদের নয়, এই সিদ্ধান্তটি সমাজ নামক একটি 'ফ্যাক্টর' এর উপর বর্তায়, যে পুরুষের স্বরে কথা বলে।

পত্রিকাগুলির পাতায় পাতায় এভাবেই ফুটে ওঠে সমাজ-মনের অসংখ্য ছবি। স্ত্রীলোকের শিক্ষা কেমন হবে তা নিয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১২৯৫ এ 'পরিচারিকা'র সংখ্যায়,

> যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের এম এ, বি এ করিয়া উকীল, ব্যারিস্টার, মিউনিসিপাল কমিশনার প্রভৃতি করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্ত্রীলোকের স্বভাব কিরূপ এবং সংসারে তাঁহার কার্য কি তাহা একেবারে অবগত নহেন। ঘোড়াকে দিয়া হাতীর কার্য করাইবার চেষ্টা করিলে যেরূপ বিফলযত্ন হইতে হয়, অথবা নীম গাছে আম্র ফলাইবার চেষ্টা করিলে যেরূপ নিরাশ হইতে হয়, স্ত্রীলকদিগকে পুরুষের মত শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের দ্বারা পুরুষের কার্য করাইবার ইচ্ছা যাঁহারা করেন তাহারাও উক্তরূপ অকৃতকার্য হন।..... পুরুষের দুঃখ হরণ, সন্তাপনাশ ও তাহাকে সান্ত্বনাদান স্ত্রীজীবনের মহাকার্য।[১]

অর্থাৎ নারীশিক্ষার প্রসারে কোন বাধা নেই, কিন্তু নারী শিক্ষিত কেন হবে, যাতে সে পতিসেবা, সন্তানপালন, সংসারের হিসেবনিকেশ এগুলো সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। আমরা আলোচনার শুরুতে এরকম উদাহরণ দেখিয়েছি।

এর থেকে একটু অন্যরকম সুর-ও আছে,-

> একদিকে ঐ সকল উপাধিবৃত্তি আর অন্যদিকে কাব্য নাটক চর্চা এবং সাময়িক পত্রে বালিকাগণের পদ্য প্রবন্ধ, ইহাই কি নারীশিক্ষার চরমফল হইবে? ইহা অপেক্ষা আর না হয় এই পর্যন্ত প্রত্যাশা করিব যে, ভবিষ্যতে কেহ কেহ ডাক্তার ও শিক্ষয়িত্রী এবং উকীল হইয়া অর্থ উপার্জনে সফল হইবেন। বিদূষী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি

১। তদেব

> হইলে তাহাদিগের নিকট সমস্ত ভালো বিষয়েরই আশা করা যাইতে পারে।[২]

মজার বিষয়, এই বামাবোধিনী পত্রিকাই নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলছে,

> স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্যস্থানে বাহির হইলে যখন কিছুমাত্র উপকার না হইয়া কেবল অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তখন প্রকাশ্যস্থলে যাওয়া ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ আচরণ করা হয়। অতএব ইহাকে যথার্থ স্বধীনতা না বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতা বলা যায়। তাহারা বাহির হইলেই ইন্দ্রিয় পরাধীন দুরাত্মারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া এককালে বিনাশ করিয়া ফেলিবে, অতএব এরূপ অনুচিত কর্মে এখন কাহার যোগ দেওয়া উচিত বোধ হয় না।[৩]

তাহলে কি স্ত্রীস্বাধীনতাকে একেবারেই আমল দেওয়া ঠিক মনে করছে না সেকালের সমাজ? অথচ অনেক শিক্ষিত মহিলারাই তো বাইরে বেরিয়েছেন, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর আত্মকথা ‘পুরাতনী’ তে বলেছেন তাঁর বাইরে বেরনোর কথা এমনকি বলেছেন সেই সময়ের অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েদের অগ্রসরতার কথা,(দ্রষ্টব্যঃ তৃতীয় অধ্যায়)।স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়, কেমনই বা হবে তার স্বরূপ, স্বধীনতা আসলে কতখানি এসব বিষয় নিয়েও ভাবনাচিন্তা হত পত্রিকাগুলিতে, ‘পরিচারিকা’ তে তো স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থ কী সে বিষয়ে একটি ‘মডেল’-ই পেশ করা হয়েছিল।

> স্ত্রী স্বাধীনতার অর্থ কি?
>
> পুরুষদিগের সহবাসে অযথা প্রবৃত্তি, অধিক প্রকাশ্যভাবে রাজপথে গমনাগমন করা স্ত্রীস্বাধীনতা নহে।
>
> -প্রকাশ্যস্থানে বক্তৃতা করা স্ত্রীস্বাধীনতা নহে।

২। বামাবোধিনী, ১৮৮৭ , ভারতী রায় সংকলন ও সম্পাদনা, *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা,* কলকাতা : আনন্দ, ডিসেম্বর ২০১৪ , পৃষ্ঠাঃ ১৭৬

৩। বামাবোধিনী, ১৮৬৪ , ভারতী রায় সংকলন ও সম্পাদনা, *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা,* কলকাতা : আনন্দ, ডিসেম্বর ২০১৪ , পৃষ্ঠাঃ ১৫১

- অনিষ্টকারী অনীতিপূর্ণ নাটক নভেল ইত্যাদি পাঠ করা স্ত্রীস্বাধীনতা নহে।

- অসচ্চরিত্র পুরুষদিগের সম্মুখে যাওয়া স্ত্রীস্বধীনতা নহে।

- পুরুষ ভৃত্যদিগের সহিত কলহ করা বা কোথায় বা বস্ত্র পরিধানে কোনরূপ অসাবধান হওয়া স্ত্রীস্বধীনতা নহে।

-পুরুষোচিত আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছদ, আলাপ আমোদ ইত্যাদি করা স্ত্রীস্বাধীনতা নহে।

স্ত্রীস্বাধীনতা কি?

-উপযুক্ত সৎজ্ঞান উপার্জন করা।

- স্বাধীনভাবে সাধু লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বর উপাসনা করা।

-ভালো লোকদিগের সহিত সৎপ্রসঙ্গ করা এবং অন্যান্য নির্দোষ বিষয়ে পরিমিত আলাপ করা।

-স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা ভদ্রতা এবং পবিত্রতার উপর কোনরূপ আঘাত হইতে না দেওয়া।

- পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাতীয় অথচ ভদ্ররুচি সঙ্গত করা।

- সময় বিশেষে দেশ ভ্রমণ ও বায়ু সেবন করা। [১]

এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম মহিলাদের জন্য লেখা পত্রিকায় মহিলাদের বিদ্যাশিক্ষা কেমন হবে, স্বধীনতা কেমন হবে, সেই সব নিয়ে নানা কথা, তর্কবিতর্ক হচ্ছে, আমরা দেখব মহিলারা নিজেরা যখন লিখছেন, তখন অদৃষ্টকে সবার আগে দোষ দিচ্ছেন, ফলে যুক্তিবোধ তাঁদের আচ্ছন্ন 'দয়াময়ের কৃপায়'। তাঁদের শিক্ষা পাওয়া, কাব্য লেখা নেহাতই ঈশ্বরের কৃপায়, পুরুষের ইচ্ছায়। ফলে এখেত্রেও পুরুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে নারী আবার ফিরছে সুগৃহিণী তকমা নিয়ে-

---

১। 'পরিচারিকা', "স্ত্রী স্বাধীনতার অর্থ কি?", ১২৮৭, স্বপন বসু, *সংবাদ- সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, অক্টোবর ২০০৩, পৃষ্ঠাঃ ৪০৫

> শুদ্ধ লেখাপড়া করিলেই যে গুণবতী হয় এরূপ নহে, যে নারী বিনয়, নম্রতা ও সুশীলতাগুণে ভূষিত হইয়া স্বচ্ছন্দে পতিপুত্রাদিসহ সংসার ধর্ম করেন, তিনিই প্রকৃত গুণবতী।[২]

তবে এমন কথাও উঠে আসে -

> হে বঙ্গবাসিনী ভগ্নীগণ, পুরুষদিগকে যে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছে, আমাদিগকেও সেই পরমেশ্বর সৃজন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে যেরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগকেও ঐ সমস্ত বিষয়ে অধিকারী করিয়াছেন।.....এই সকল দ্বারা জানা যাইতেছে যে সেই সর্বমঙ্গলাকরের ইহা কখনই অভিপ্রায় নহে যে পুরুষেরাই জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিবেন, আর আমরা জিয়ন্তে অজ্ঞানতা নিবন্ধন অতি কষ্ট সহ্য করিব।[১] -

এই প্রশ্ন করার মত স্থানটুকুই তো ছিল না এর আগে। 'ভারতী' পত্রিকায় মেয়েরা রীতিমত যুক্তিতর্কের অবতারণা করে বিচার করে দেখছে 'পদবী' ব্যবহার করা উচিত কিনা। (ভারতী, আষাঢ় ১২৯০, সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার ও ভারতী,ভাদ্র ১২৯০, প্রতিবাদ দ্রষ্টব্য)

অবশেষে পদবী ব্যবহার করা হোক বা 'দাসী' বা 'দেবী' থাকুক, সেটা যেমন আমরা বিচার করছি তেমন এটাও বিচার্য যে 'পদবী' ব্যবহারের প্রশ্নই আসত না উনিশ শতকের আগে। কেউ কখনও বলেননি, ফলে জানা যায় না এই বিষয় নিয়ে আদৌ কতটা চিন্তাভাবনা হয়েছে এর আগে। মজাফারপুরের কোন এক অজ্ঞাত নারী গোটা সমাজের কাছে প্রকাশ্য পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রশ্ন রাখতে পারছেন,

> যখন পুরুষেরা এক স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন,তাহাতে তাঁহাদের পাপগ্রস্ত হইতে হয় না।তখন পতিহীন

২। শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী, বিল্লগ্রাম, বামাবোধিনী, অক্টোবর, ১৮৭০ তদেব

১। শ্রীমতী মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, বামাবোধিনী, ডিসেম্বর, ১৮৬৪, তদেব

> অবলা কামিনীর পুনরায় বিবাহ করিলে তাহারা তাহাতে কেন দূষিত হয়েন?[২]

এসব কথা বলার জায়গা করে দিয়েছিল উনিশ শতকের এই পত্রিকাগুলি। এখন রোহিণীদের আর নির্জন বাড়িতে অপঘাত মৃত্যুবরণের পূর্বে অন্তত নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা যায়।

পত্র-পত্রিকাগুলিতে মেয়েদের সভা-সমিতির খবরও প্রকাশিত হচ্ছিল। কোন মহিলা ডাক্তারি পাশ করলেন, এফ এ পাশ করলেন, কেম্ব্রিজে গিয়ে পড়াশোনা করছেন সেই সব খবরও প্রকাশিত হচ্ছে।পত্রিকায় মেয়েরা আলোচনা করছেন তাঁদের পোশাক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে, এমনকি উঠে আসছে বারবনিতাদের কথাও-

> হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছেন কলিকাতা ও ইহার উপনগরে ৬৮৪৫ টী বেশ্যা বাস করে। এই হতভাগা পতিতা রমনীদিগের দ্বারা অশেষ পাপকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।
>
> ইহাদিগের উদরারথ সদাশয় ব্যক্তিগণ কি কোন প্রকার চেষ্টা করিতে পারেন না?[১]

এইসকল পত্রিকায় বেশ কিছু আধুনিক বিষয় পাওয়া যায়, তার একটি ক্ষুদ্র তালিকা করা যায়-

প্রকাশ	পত্রিকার নাম	শিরোনাম	বিষয়
জুলাই ১৮৬৭	বামাবোধিনী	‘স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার’	মেয়েদের সম্পর্কে সমাজের মনোভাব
১৮৭০	বামাবোধিনী	‘হিন্দুবিধবা’	বিধবাদের করুণ অবস্থা
১২৮২	বিনোদিনী	‘ বর্তমান সমাজে বঙ্গাঙ্গনা’	বাঙ্গালি নারীর করুণ অবস্থা
১২৮৩	বিনোদিনী	‘নারী’	ঐ

২। বামাবোধিনী, মে, ১৮৭৫ তদেব

১। বামাবোধিনী, ডিসেম্বর ১৮৬৬, তদেব

১২৯৮	পরিচারিকা	' শাশুড়ির অত্যাচার'	অভিজত পরিবারের অন্দরের বর্ণনা
১৮৬৮	বামাবোধিনী	'বর্তমান হিন্দুরীতি ক্রমে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা উচিৎ হইয়াছে কিনা?'	বিধবাবিবাহের প্রতি মেয়েদের ধারণা
১২৯৭	পরিচারিকা	'কৌলীন্য ও বহুবিবাহ'	কৌলীন্যের কুফল

একথা সত্যি মেয়েদের চিন্তাভাবনার জগৎ বদলাচ্ছিল। বেশ কিছু জায়গায় হয়ত মেয়েরা পুরাতনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারছেন না, সনাতন-আধুনিকের একটা টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তা সত্বেও মেয়েদের মন বদলাচ্ছিল অন্তত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে। আর অন্দরের অন্তর বদলের জন্য দায়ী হয়েছিল এই পত্রিকাগুলি একথা স্বীকার না করে কোন উপায় থাকে না।এদের মধ্যে দুটি পত্রিকার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১) ১৮৭৫-১৮৭৭ মাত্র দুবছর চলেছিল '*বঙ্গমহিলা*'। মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের চোরাবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়াসে ডঃ ভুবনমোহন সরকারের অধ্যক্ষ সমিতির পক্ষ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এর লিখিত উদ্দেশ্য ছিল

> 'বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নিতিগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সকল উপহার দেওয়া।' [১]

প্রধানত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

২) এরপরে ১৮৯৮-১৯০৩ পর্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছে '*অন্তঃপুর*' পত্রিকাটি। বনলতা দেবী, হেমন্তকুমারী চৌধুরী, কুমুদিনী মিত্র প্রমুখ ছিলেন বিভিন্ন সময়ে এর সম্পাদনার দায়িত্বে।

১। *বঙ্গমহিলা মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা,* ১২৮২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪১৮/২

'কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এবং লিখিত' পত্রিকাটি সেই সময়ের তুলনায় প্রায় বিপ্লব ঘটাচ্ছে। এর বিষয়বৈচিত্র্য, লেখনী সেই কালের পক্ষে ছিল অনেকটাই নতুন। উনিশ শতকের একসময় যখন বিদ্যাসাগর মশাই অনুশোচনা করে বলছেন,

> হা অবলাগণ। তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।[২]

উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে এই দুটি পত্রিকা কিন্তু তার থেকে অনেকটাই এগিয়ে ভাবছে।দুটি পত্রিকা, একটি প্রতিষ্ঠানমুখী অন্যটি প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত, এদের বিভিন্ন সংখ্যায় সেই সময়ের নারীশিক্ষার, এবং সমাজে তার অবস্থানের বাস্তব ছবিটি তুলে ধরছে। অথচ এই দুটি পত্রিকা নিয়ে আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে।

সমসাময়িক এই সকল পত্রিকা গুলির থেকে 'বঙ্গমহিলা' ও 'অন্তঃপুর' অনেকাংশেই গুরুত্বপূর্ণ। পরিচারিকার মত পত্রিকা যখন ঘোষণা করছে ধর্মযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার, সেই সময়ে দাঁড়িয়েও এই দুটি পত্রিকার এমন কোন দায় ছিল না। তারা বারবার নারী স্বাধীনতা, নারীশিক্ষার কথা বলেছেন। নারী শিক্ষাকে চার দেওয়ালে বন্ধ করার অভিপ্রায় তাদের ছিল না। এদের বিষয় বৈচিত্র্যও অনেক। এঁরা যেমন নারী শিক্ষার কথা বলেছেন, তেমনি নারীচরিত্র নির্মাণেরও চেষ্টা করে গেছেন, তার পাশাপাশি শিক্ষিত নারীরা পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তাদের মতামত। শুধু ঘর সামলানো নয়, সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতির পরিচয় ও দিয়েছে এই পত্রিকা দুটি। ১৮৭৫-১৯০৩ বাংলায় নারীদের সুস্পষ্ট অবস্থানটি যথাযথ ভাবে তুলে ধরে এই দুটি পত্রিকা। প্রায় ২৫ বছরের একটি বিবর্তনের ইতিহাস উঠে আসে পত্রিকা দুটির আলোচনাসূত্রে। (দ্রষ্টব্যঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়)।

২। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে*, কলকাতা : স্ত্রী, ২০১০, পৃষ্ঠাঃ ১

উনিশ শতকের বঙ্গমহিলার অন্তঃপুরকে ঢেলে সাজানোর যে প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল, তা উনিশ শতকের শেষ তিনটি দশকে কি চেহারা নিয়েছিল, ১৮৭৫-১৮৯৭ এই সময়কালে বাংলার শিক্ষিত মানুষ নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা সম্পর্কে কোন অবস্থানটি নিচ্ছে, শিক্ষিত মহিলারাই বা এই শিক্ষা নিয়ে কোনদিকে এগোতে চাইছেন তার ক্রমবিবর্তন টিকে বোঝার চেষ্টা করাই গবেষণাটির উদ্দেশ্য।

দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার পত্রিকা, একটি এক বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র অন্যটি স্বাধীন, প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত। এই দুইএর স্বরটি ঠিক কেমন, প্রায় একই সময়ের দুটি পত্রিকা কি এক রকম কথা বলছে নাকি এদের স্বর পরিবর্তিত হচ্ছে, নাকি এরা আসলে উনিশ শতকের সামাজিক দ্বিধা দ্বন্দকেই তুলে ধরছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি করা চশমা এঁটেই এরা মেয়েদের দেখতে চাইছে নাকি শিক্ষিত মেয়েদের নতুন অস্তিত্ব তৈরি করার উদ্যোগ নিচ্ছে প্রভৃতি বিষয়গুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের নারী সমাজ এবং শিক্ষার বিবর্তনের ধারাটিকে বুঝতে চাওয়ার জন্যই অপেক্ষাকৃত কম চর্চিত এই দুটি পত্রিকার আলোচনা বিশেষ ভাবে দরকার বলে মনে হয়। ‘ভারতী’, ‘বামাবোধিনী’রা উনিশ শতকের নারীর জীবনের যে অর্থটি তুলে ধরতে চেয়েছিল, উনিশ শতকের শেষ লগ্নে এসে এই দুটি পত্রিকা আদৌ তার উত্তরাধিকার বহন করে কিনা, উনিশ এবং কুড়ির সংলগ্নে এসে তাঁরা নতুন কোন দিশা নারীসমাজকে দেখাতে পারছেন না গতানুগতিকতাতেই তাঁদের কণ্ঠও মিলে যাচ্ছে, এর হদিশ পাওয়ার জন্য *‘বঙ্গমহিলা’* এবং *‘অন্তঃপুর’* অতি কম আলোচিত পত্রিকাদুটির সম্যক বিশ্লেষণ দরকার। এই বিষয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আগের অধ্যায়ে পত্রিকার ইতিহাস আলোচনা সূত্রে আমরা দেখেছি, উনিশ শতকে মহিলাদের পড়ার ক্ষমতা তৈরি করা এবং তাঁদের প্রতিনিয়ত লিখতে ও লেখা ছাপতে উৎসাহী করে তুলছিল এই মহিলাদের পত্রিকাগুলি। তাই এই অধ্যায়ে আমরা দেখব উনিশ শতকে মহিলাদের শিক্ষা নিয়ে যে কর্মকাণ্ড চলেছে, সেখানে এই পত্রিকা দুটি কি ভূমিকা গ্রহণ করছে।

উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রলোকের শিক্ষার ইতিহাসটি বর্ণময়। তবে, উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের শিক্ষাভাবনার সম্পূর্ণ আলোচনা করতে হলে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু হওয়ার আগেও এদেশে একটা প্রথাবদ্ধ দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির বাণিজ্য ও পরে সাম্রাজ্য স্থাপনের অনেক আগে থেকেই বাংলায় টোল, পাঠশালা, মাদ্রাসা, মক্তব প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি বিভিন্ন ধর্ম, শ্রেণী ও বর্ণের বাঙালির শিক্ষার চাহিদা পূরণ করত। বাংলার টোল প্রধানত উচ্চবর্ণ ও শ্রেণীর হিন্দুদের সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও শাস্ত্র শিক্ষার পাঠ দিত এবং মাদ্রাসাগুলিতে প্রধানত উচ্চশ্রেণীর মুসলমান যারা 'আশরাফ' বলে পরিচিত তারা আরবী ভাষা ও ইসলামি শাস্ত্র চর্চা করত।বলা বাহুল্য নিম্নশ্রেণীর এবং বর্ণের বাঙালি সে কালেও প্রথাগত শিক্ষার অধিকার পেত না। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

উনিশ শতকের গোড়াতেই কিভাবে দেশীয় শাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে গেল তা আগের অধ্যায়েই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে নজর দেওয়া যাক উনিশ শতকের শিক্ষার ইতিহাসটিতে।

উনিশে ঢোকার আগেই এদেশে একটি বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে, তা মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাব। ১৭৭৮ সালে উইল্কিন্সের তত্ত্বাবধানে পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি হরফে ছাপা হচ্ছে হ্যালহেডের *A Grammar of the Bengal Language*, বইটি মূলত ইংরাজিতে হলেও এর অনেকটা অংশ জুড়ে বাংলা ভাষার উদাহরণ দেওয়া হল বাংলাতেই। 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং' রচিত হ্যালহেডের বইতেই প্রথম ছেনিতে কাটা ধাতব বিচল বাংলা হরফ ছাপার প্রযুক্তি ব্যবহৃত হল পঞ্চাননের হাতে, বইতে যদিও তাঁর নাম ছিল না। বাংলা সাহিত্যের গতিপথটাই ঘুরে গেল। কতটা ঘুরে গেল, সবটা তক্ষুনি বোঝা যায়নি।

> মুদ্রণযন্ত্র বেশ কিছুদিন বাঙালিদের কাছে 'সাহেবদের ঠাকুর' হয়েই ছিল।[১]

এরপর ১৮০০ সালে কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড এর উদ্যোগে স্থাপিত হল শ্রীরামপুর মিশন ও ছাপাখানা। এই মিশনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করা এবং তা সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করা। শ্রীরামপুরে মিশন-প্রেস স্থাপন বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় ঘটনা।

> এই প্রেসে বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাপা হইল (১৮০০-০৯)। বিলাত হইতে নব-আগত কোম্পানির কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কোম্পানি ১৮০০ অব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করিল। এখানে প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন শ্রীরামপুর মিশনের কর্তা উইলিয়ম কেরি। কেরির

১। শাশ্বত ভট্টাচার্য, 'উনিশ শতকঃ বাংলা নতুন সাহিত্যের শুরু', "উনিশ শতকের বাংলা", অলোক রায় , গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাংলা,* কলকাতা : পারুল, ২০১৩, পৃষ্ঠাঃ ২১৩-২২৭

> বিশেষ চেষ্টা হইল কলেজের পাঠ্যবাঙ্গালা গদ্য পুস্তক ছাপানোয়। এইসব বই শ্রীরামপুর মিশন-প্রেসে ছাপা হইল।[১]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা সাহেব কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য হলেও ("This education must be founded in a general knowledge of the branches of the literature and science which form the basis of the education of persons destined to similar occupation in Europe". [২]) একে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষা এক নতুন দিক পেয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশন আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ একইসঙ্গে বাংলা বই প্রকাশ এবং বাংলা গদ্য লেখার একটা জোরদার প্রকল্প চালিয়েছিল। সরকারি কাজেকর্মের জন্য শুরু হল এক নতুন বাংলা- বিষয়ী লোকের ভাষা – উনিশ শতকেও এই গোষ্ঠীর ভাষাই মান্যতা পাবে- সতেরো- আঠারো শতক কালে যে আরবি-ফারসি শব্দ বাংলাকে জমিয়ে তুলেছিল- তাকে অনেকটাই সাফ করে দেয় এই প্রকল্প। রামরাম বসুর প্রথম বই ১৮০১-এ বেরোনো *'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'* আর পরের বছরেই বেরোনো *'লিপিমালা'*-র গদ্যের তফাত এর প্রমাণ।

সরকারী কাজে ক্রমশ ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাঙালি সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি উৎসাহী করেছিল। প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গেও আমরা দেখি কিভাবে নতুন তৈরি হওয়া বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ কোম্পানির অধীনে চাকরি-ব্যবসার সুযোগ পাওয়ার জন্য রাতারাতি ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠেছিল। প্রাক-আধুনিকের সরকারী ভাষা আরবি-ফারসিকে সরিয়ে বাঙালি মেতেছিল এক নতুন ভাষাকে আয়ত্ত করতে। দীননাথ সেন তাঁর *'উনিশ শতকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার'* প্রবন্ধে বলেন, ১৭০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ- এই

১। সুকুমার সেন, *'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'*, দ্বিতীয় খণ্ড, একবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ১-৩৩

২। Governor general's minute, Dt. 18th August, 1800, pp 71

একশো বছরে উপনিবেশের শিক্ষার প্রতি কোম্পানি কোনো দায়বদ্ধতা দেখায়নি। চার্লস গ্রান্ট, উইলবারফোর্স প্রমুখ ইংরেজ বিদ্বজ্জন এ বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করলেন। তার ফলে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের ইংরেজ সরকার কোম্পানিকে বাধ্য করলেন তাদের বানিজ্যলব্ধ অর্থ থেকে ১ লক্ষ্ টাকা ভারতে শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে বরাদ্দ করতে। গড়া হল ১০ সদস্যের জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশান। কমিটি এমন একটি নীতি নির্ধারণের কথা বলল যার মূল কথা প্রাচ্য শিক্ষাদর্শ এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সমন্বয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের জন্য শিক্ষাপ্রকল্প রচনার সূত্রপাত এখান থেকেই। এরপর ১৮৩৫ সালে বেন্টিঙ্ক শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি কমিটি তৈরি করেন এবং তার চেয়ারম্যান করেন মেকলে সাহেবকে। মেকলে অবিলম্বে তাঁর প্রতিবেদন পেশ করলেন। এই প্রতিবেদনই বিখ্যাত 'মেকলেস মিনিটস'। এই 'মিনিটস' প্রকৃতপক্ষে ভারতে ঔপনিবেশিক শিক্ষার সুদূরপ্রসারী পরিণতি নিয়ে আসে। এই নীতির নাম 'ইনফিলট্রেশন থিয়োরি', চুইয়ে-পড়া তত্ত্ব। সোজা কথায় মেকলে সাহেবের আকাঙ্খিতরা হবে ইংরেজ উপনিবেশের বিস্বস্ত পাহারাদার। কাজটার জন্য গোড়া থেকেই ধরতে হবে ভারতীয় শিশুর নমনীয়তাকে। শিক্ষার মডেলটা হবে স্বদেশচেতনার গোড়া মেরে দিয়ে সেখানে ইংরেজপ্রীতির বীজ বপন করা।

ফলে শুরু হয়ে গেল ইংরেজি শিক্ষা। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে ছটি এবং ১৮১২-র মধ্যে আটটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮১৬-১৭ সালের মধ্যে প্রায় শতাধিক বিদ্যালয় খোলে এবং ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৭০০০ এর ওপর। ১৮২৩ এর মধ্যে ১৬০ টির বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

> শুধু বুনিয়াদি শিক্ষা নয়, ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে যেতে লাগল বাঙালির সামনে।[১]

১। আশিস খাস্তগীর, *লেখাপড়া করে যে-ইঃ উনিশ শতকের পাঠ্যপুস্তক*, অলোক রায়, গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাংলা,* কলকাতা : পারুল, ২০১৩, পৃষ্ঠাঃ ১১৬-১৩৫

আঠারো শতকে কলকাতা মাদ্রাসার (১৭৮১) প্রতিষ্ঠার পর উনিশ শতকে এসে এক এক করে প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ(১৮১৭)যা পরবর্তীতে পরিচিত হবে প্রেসিডেন্সি কলেজ(১৮৫৪) হিসেবে, শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮), সংস্কৃত কলেজ(১৮২৪), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ(১৮৬২), সেন্ট পলস কলেজ(১৮৬৫) মেট্রোপলিটন কলেজ(১৮৭২), সিটি কলেজ(১৮৭৮), বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১৮৮০), বেথুন কলেজ (১৮৮২), রিপন কলেজ(১৮৮৪), উত্তরপাড়া কলেজ (১৮৮৭), বঙ্গবাসী কলেজ(১৮৮৭)-এর মত নামজাদা সব প্রতিষ্ঠান।

এরপর অবশ্যই আসে পাঠ্যপুস্তকের কথা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরেই ১৮১৭ সালে ১৬ জন ইউরোপীয় আর ৮ জন দেশীয় সদস্যকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় 'স্কুল বুক সোসাইটি'-র। শ্রীভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', দ্বিতীয় পর্যায়ে বলেছেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক দেশীয় ছাত্রদের কাছে দুর্মূল্য ছিল। তাই 'স্কুল বুক সোসাইটি'র কাজ ছিল সুলভে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া।

ফোর্ট উইলিয়ামে তাই গদ্যরচনার প্রধান প্রেরণা ছিল দেশীয় সাহিত্য-দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাদির অনুবাদ,

অন্যদিকে

> শ্রীরামপুরে ইংরেজি বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করল। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত শিক্ষাগত 'মাসিক পুস্তিকা' 'দিগদর্শনে'র প্রথম সংখ্যাতেই অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 'বলুন দ্বারা সাদনর সাহেবের আকাশ গমন' সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। তাছাড়াও আরো বিভিন্ন সংখ্যায় প্রাণিতত্ত্ব, জ্যতিস্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ক নানা গদ্য রচনার সন্নিবেশ দেখা যায়।[১]

১। শ্রীভূদেব চৌধুরী , *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় পর্যায়,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ৭২-৭৯

বাঙালি পুরুষের পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের ধাপটি যদি এমন হয়, অন্যদিকে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রটি এমন সহজ স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয়নি। প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা সূত্রে আমরা দেখেছি নারী শিক্ষার সামাজিক বিবর্তনের রূপটি। উনিশ শতকের বাঙালি মনীষা নারী শিক্ষা নিয়ে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমেই নারীর শিক্ষালাভকে সহজভাবে নেয়নি। প্রচলিত বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৮১৮ সালে 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' স্থাপিত হয়েছিল। অপরদিকে একই সময়ে বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি সোসাইটির পক্ষ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের উদ্দ্যেশ্য নিয়ে ছেলেদের জন্য স্কুল স্থাপিত হয়।

> তৎকালীন দেশীয় সমাজের নিয়ম অনুযায়ী এই সমস্ত স্কুলে মেয়েদের শিক্ষার নানা অসুবিধে ছিল। তৎসত্ত্বেও ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি প্রথমে নেটিব ফিমেল স্কুল স্থাপন করে। সেই পরিকল্পনা কিছু পরিমাণে কার্যকরী হওয়ায় অন্যান্য মিশনারিদের পক্ষ থেকেও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তাদের মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারি সোসাইটি হল অন্যতম।[১]

স্বপন বসু তাঁর *'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা'* বইতে দেখান, ১৮১৯-এ রেভারেন্ড ডাব্লিউ এইচ পিয়ার্স –এর সভাপতিত্বে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengali Female Schools) স্থাপিত হয়। এর অর্থানুকূল্যে নন্দনবাগানে মেয়েদের একটি স্কুল স্থাপিত হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার গৌরীবাড়ি, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে সোসাইটি আরও তিনটি স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮২৩ সালে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' 'বেঙ্গল খ্রিসচান স্কুল সোসাইটি'-র মহিলা বিভাগে পরিণত হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই 'ব্রিটিশ এন্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি' ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য মিস মেরি অ্যান কুককে এদেশে পাঠায়, এবং তিনি এই কাজে স্কুল সোসাইটির সাহায্য দাবী করেন। এই সময়েই রাধাকান্ত দেব, ১৮২১ এর ১০ই ডিসেম্বর ডাব্লিউ এইচ পিয়ার্সকে লেখেন-

---

১। বিনয়ভূষণ রায়, *অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা,* কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ২১-২৭

> I beg leave to observe, that the British and Foreign School society, bearing in the mind the usages and customs of the Hindoos, have sent out Miss Cooke to educate Hindoo females,and that I fear none of the good and respectable Hindoo families will give her access to the women's Apartment,nor send their females to her school if organized. They may be all convinced of the utility of getting their female children taught at home in Bengalee,by their domestic school masters, as some families do, before such female children are married or arrived to the age of 9 or 10 years at farthest. For the reason I am humbly of opinion that we need not have a meeting to discuss on the subject of the education of Hindoo females by Miss Cooke,who may render her services (if required) to the schools lately established by the Missionaries for the tuition of the poor classes of Native females. [১]

স্কুল সোসাইটি হতাশ করলেও, চার্চ মিশনারি সোসাইটি তাঁর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের সাহায্যেই মিস কুক কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সক্ষম হন। এই আটটি স্কুল হল- ঠনঠনিয়া স্কুল, মির্জাপুর স্কুল, প্রতিবেশী স্কুল, শোভাবাজার স্কুল, কৃষ্ণবাজার স্কুল, শ্যামবাজার স্কুল, মল্লিকবাজার স্কুল ও কুমারটুলি স্কুল। শোভাবাজার স্কুল ছাড়া বাকি সাতটি স্কুলের মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৯৭(Hindoo Female Education, Priscilla Chapman (1839), Pp 79-80)। ১৮২৩-এ তাঁর পরিচালনাধীন স্কুলের সংখ্যা হয় ২২, ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০০।

এইসব স্কুলের উঁচু ক্লাসগুলিতে মিস কুক নিজেই পড়াতেন।[২]

১। স্বপন বসু সম্পাদিত, *উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা,* কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৮ শ্রাবণ ১৪১৬, পৃষ্ঠাঃ ১০-১১

২। বিনয় ঘোষ , *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,* তদেব

১৮২৪ সালে চার্চ মিশনারি সোসাইটি, ‘লেডিস সোসাইটি’ (Ladies’ Society for Native Female Education in Calcutta and its vicinity) গঠন করে তাদের হাতে উক্ত স্কুল গুলির পরিচালনা করার দায়িত্ব দেয়। আমহার্স্ট-পত্নী ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। এছাড়াও ডেবিড হেয়ার একে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। জুন ১৮২৫ সালে গৃহনির্মাণের জন্য সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েও ব্যর্থ হলে রাজা বৈদ্যনাথ একে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন এবং এই টাকা ব্যয় করা হয় সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠায়।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখানো হল মিশনারিরা কিভাবে বাংলায় নারী শিক্ষাকে অগ্রসর করছিল। কিন্তু এতেই নারী শিক্ষার বাস্তব চিত্রটি সুস্পষ্ট হয় না। মিশনারিরা স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও প্রসারকে গুরুত্ব দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এদের প্রচেষ্টা শুধুই বঙ্গনারীর উন্নতিসাধন ছিল না। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তারা আসলে ধর্মপ্রচারকেই গুরুত্ব দিতেন। ‘A Prize Essay on native Female Education’ বইতে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এদের শিক্ষার আড়ালে ধর্মশিক্ষার দানের অভিপ্রায়ের কথা। আর সাধারণ মানুষ কখনোই এইসব প্রতিষ্ঠানকে ভালো নজরে দেখেনি, কারণ এইসব স্কুলগুলিতে বাইবেল অবশ্যপাঠ্য ছিল। আমরা আগেই দেখেছি উনিশ শতকের প্রথম পাদে বাঙালি সমাজে পর্দাপ্রথা চালু ছিল, সুতরাং বোঝাই যায় ভদ্রঘরের মেয়েরা এইসকল স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত না। যারা যেত তাদের বেশিরভাগই অত্যন্ত গরীব। এই কথা আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখি, ১৮৩৮ সালে চুঁচুড়ার কোন অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ ‘সমাচার দর্পণে’ লেখেন,

> ..... দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কয়েকজন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত তাঁহারদের পাঠশালাতে গমন করেন কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাঁহারদের ঐ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে।[১]

এরপর ১৮৪৯-এর মে মাসে বেথুনের প্রচেষ্টায় মাত্র একুশটি মেয়েকে নিয়ে চালু হয় 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'।যদিও স্কুলটির যাত্রাপথ একেবারেই মসৃণ ছিল না। স্বপন বসুর, 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা' বই থেকে জানতে পারি এই বিদ্যালয়ে যাঁরা মেয়েদের পাঠাতেন, তাঁদের একঘরে করা হত। ছোট ছোট মেয়েদের ব্যঙ্গ করে নানা ছড়া কাটা হত, যেমন,

> এইবার কলির যা বাকি ছিল হইয়া গেল। মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।[২]

এছাড়াও স্কুলে পড়ার অপরাধে অনেক মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধও ভেঙে গেছিল এমন কথাও উঠে আসে। বেথুনের মৃত্যুর পর স্কুলের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়। এর আগে ১৮৪৭ এ বারাসতে একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।এরপরেও ১৮৫৭-৫৮ বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে প্রায় পঞ্চাশটির মত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের খবর পাওয়া যায়, বেশীদিন না চললেও জনমানসে মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে কুসংস্কার যে ধীরে ধীরে কাটছিল, তা এর থেকে বলাই যায়।

এইসব স্কুলগুলিতে মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হত তা ছিল একেবারেই প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ। উনিশ শতকের ষাটের দশকে দেখব মেয়েরা কতখানি শিক্ষা পাবেন বা কোন পদ্ধতিতে তাঁদের শিক্ষা দেওয়া হবে-এইসকল বিষয়গুলি ক্রমশ চর্চা হচ্ছিল।ব্রাহ্ম সমাজেও এই বিতর্ক উঠতে থাকে। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উমেশচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র সেনের

১। তদেব, ১৬৮

২। তদেব, ৯-৫০

মত ব্রাহ্মরা বলতে থাকেন, মেয়েরা যাতে 'সুগৃহিণী' ও 'সুমাতা' হতে পারেন এমন 'স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা'ই মেয়েদের দেওয়া উচিত। অন্যদিকে ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবানচন্দ্র বসুর মত ব্রাহ্মরা, যাঁদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল, 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' (১৮৭৩), পরে ১৮৭৮ সালে এটি বেথুন স্কুলের সাথে একত্রিত হয়।

অন্তঃপুরের এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গীণ করে তুলতেই উনিশ শতকের মাঝামঝি সময় থেকে একের পর এক মহিলাদের জন্য পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।এর সূচনা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।এখন প্রশ্ন ঠিক কবে থেকে বঙ্গীয় অধিবাসীরা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে রায় দিচ্ছেন? এই বিষয়ে একদম নিশ্চিত না হলেও কয়েকটি লেখা আমাদের নজরে আসে,

- ১৮২৫ সালে *'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'* পত্রিকাটি ফেব্রুয়ারি মাসে একটি লেখা প্রকাশ করে, যেখানে তারা বলে কিভাবে মাত্র তিন বছরের কম সময়ের মধ্যে প্রায় ত্রিশটি নেটিব ফিমেল স্কুল স্থাপিত হয়েছে এবং প্রায় ৬০০-র মত বালিকারা সেই স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করে।

- জুন, ১৮৩১ এ 'সমাচার দর্পণ' বলছে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাপ্রাপ্ত না হলে ভারতবর্ষের মঙ্গল ঘটবে না।

- ১৮৪৯ এ *'সম্বাদ রসরাজ'* বাঙালি পাঠক কে আশ্বস্ত করছে এই বলে যে বালিকাদের স্কুলে " খ্রীস্টধর্ম শিক্ষা হইবেক না"।

- ১৮৪৯ এ *'সম্বাদ ভাস্কর'* ও বলছে বিদ্যালয়ে পাঠালে মেয়েদের কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

সুতরাং দেখতে পাই উনিশ শতকের প্রায় প্রথম লগ্ন থেকেই শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায় স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে চিন্তা শুরু করেছে। সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু খেয়াল করলে দেখব এই সব আলোচনাই পুরুষের মতামত নির্ভর। নারী তাঁর শিক্ষা নিয়ে কি ভাবছেন এমন সুস্পষ্ট কথা এই সময় জুড়ে প্রায় নেই বললেই চলে। অপর একটি প্রশ্ন যেটি নানান সময়ে মনে ঘুরে ফিরে আসে, তা হল হঠাৎ করে শিক্ষিত বাঙালি স্ত্রীশিক্ষাকে এত প্রাধান্য কেন দিচ্ছে? এর একটি বড় কারণ আমরা দেখি শিক্ষিত বাঙালি পুরুষ দাম্পত্য কে গুরুত্ব দিচ্ছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য- দর্শন কে বাঙালি শুধু পাঠক্রমেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। তাই উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির কাছে স্ত্রী শুধুই সন্তান প্রসব ও পালনের 'যন্ত্র' হয়ে থাকেনি। সে যুগের ছক ভাঙা গোষ্ঠী ইয়ং বেঙ্গল ও স্ত্রীশিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে তাঁদের পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে।তবে এক্ষেত্রেও যাঁদের কথা বিশেষ ভাবে বলবার, তাঁরা ব্রাহ্ম। শ্রাবণ, ১২৭৪ বঙ্গাব্দে, *বামাবোধিনী পত্রিকা*, *'স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা'* প্রবন্ধে (পৃষ্ঠাঃ৫৫৫) বলে, উনিশ শতকের ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি নারীর বেশিরভাগই ছিলেন হয় খ্রিস্টান, নয় ব্রাহ্ম। এই প্রসঙ্গে আমরা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আত্মকথা *'পুরাতনী'*-র প্রতি নজর দিতে পারি।

> আমি বিয়ের আগেই লিখতে পড়তে পারতুম আর আমার হাতের অক্ষরের খুব প্রশংসা ছিল। আমাদের গুরুঠাকুর বাবামশায়কে বলেছিলেন যে বিদ্যাদানের উপর দান নেই। [১]

এছাড়াও তাঁরা বিয়ের পর সেজো দেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পড়তেন, এমনও বলেন মাইকেল এর লেখাও পড়তেন, পরবর্তীতে স্বামীর নির্দেশে জ্ঞানদানন্দিনী ইংরেজি

১। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী অনুলিখিত ও সম্পাদিত, *পুরাতনী,* জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কলকাতা : আনন্দ, ডিসেম্বর ২০১২ , পৃষ্ঠাঃ ১-৪৮

পড়তেও শিখেছিলেন। বামাবোধিনী পত্রিকা থেকেই জানা যায় যে, ১৮৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মদের বাৎসরিক 'মাঘোৎসবে' প্রায় ৫০ জন মহিলা যোগদান করেন এবং ধর্মীয় উপদেশ শোনার অনুমতি পান। যদিও সেই সময়কালে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে দিতে পুরুষরা আদৌ কতখানি প্রস্তুত ছিলেন সেই সন্দেহ থেকেই যায়। তবু সমকালের তুলনায় ব্রাহ্মরা যে নারীশিক্ষা, নারীমুক্তির প্রশ্নে এগিয়ে ছিলেন, তা নিয়ে অন্তত সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যেমন- উনিশ শতকের মেয়েদের উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্রিকা 'বামাবোধিনী'-ও আসলে ছিল ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র সেনের বামাবোধিনী সভার মুখপত্র। অন্তঃপুর শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার। পরবর্তীকালে এই ধারাকেই অব্যাহত রাখে *'অন্তঃপুর', 'বঙ্গমহিলা'*র মত পত্রিকা। উনিশ শতকের মাঝমাঝির পর থেকে একে একে অনেক মহিলাদের জন্য লেখা পত্রিকা ছাপা হচ্ছিল। বস্তুত এই সময় থেকেই আমরা জানতে পারি নারীসমাজ তাঁদের শিক্ষা নিয়ে কি ভাবছেন। কিন্তু তারও আগে বলে রাখা দরকার বাঙালি সেই সময়ে দাঁড়িয়েও স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার থেকেও অন্তঃপুর শিক্ষা প্রনালীকেই অধিক গুরুত্ব দিচ্ছিল।একটি ছকের সাহায্যে দেখে নেওয়া যাক, সেকালের শিক্ষিত কিছু নারীর বিদ্যাশিক্ষার স্বরূপটি।–

নাম	কিভাবে লেখাপড়া শিখছেন	পারিবারিক পটভূমি
কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮৩৭-?)	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম প্রভাবিত স্বামী
দ্রবময়ী (১৮৩৭-?)	পিতার টোলে	পিতার একমাত্র সন্তান
বামাসুন্দরী (১৮৩৮-৮৮)	স্বশিক্ষিত	ব্রাহ্ম-প্রভাবিত স্বামী
কুমুদিনী (১৮৪০-৬৫)	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী
নিস্তারিণী দেবী (১৮৪০-৬০)	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী
ব্রহ্মময়ী (১৮৪৫-৭৬)	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী
অন্নদায়িনী লাহিড়ী (১৮৪৮-?)	অংশত বাড়িতে, অংশত বিদ্যালয়ে	খ্রিস্টান পিতা, পিতৃব্য রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্ম প্রভাবিত
মনোরমা মজুমদার (১৮৪৮-১৯৩৬)	বৈষ্ণবী, মেম এবং স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১)	ঠাকুর পরিবারে, স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী
রাজকুমারী দেবী (১৮৫০-৭৬)	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী
সৌদামিনী দেবী (?-১৮৭৪)	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী

তালিকাটি গোলাম মুরশিদ এর, *নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* থেকে গৃহীত।

উপরের তালিকাটি থেকে স্পষ্ট বাঙালি মেয়ের পড়াশোনা সুগম হয়েছে তখনই যখন তার স্বামী, পরিবার অনুমতি দিয়েছে। রাসসুন্দরীর মত দু-একজনের কথা পাই তবে ভুলে গেলে চলবে না, রাসসুন্দরী পড়তে শিখেছিলেন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার উদ্দেশ্যে।এবং তাঁর বর্ণনায় জানা যায় কিভাবে অতি গোপনে, কুণ্ঠিত হয়ে তিনি পড়তে শিখেছিলেন। তাঁর এত লজ্জা, বিড়ম্বনা সেকালে নারীশিক্ষার প্রতি সামাজিক, পারিবারিক অবজ্ঞাটিকেই প্রকাশ করে।

১৮৬৯ এর পর থেকে একের পর এক মহিলাদের পত্রিকাগুলি অন্তঃপুরের ঘেরাটোপেও নারীর শিক্ষার দিকে নজর রেখেছিল। শুধু পড়তে বা লিখতে জানাই নয়, পত্রিকাগুলি সুযোগ করে দিয়েছিল, এর মাধ্যমে নারীরা যাতে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। উনিশ শতকের শেষের তিনটি দশকেও পত্রিকাগুলির এই ধারা অব্যাহত ছিল। আলোচ্য দুটি পত্রিকার দিকে একটু নজর দেওয়া যাক।–

বঙ্গমহিলার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১২৮২) ভূমিকায় স্পষ্ট বলা হচ্ছে,

> ..... বালিকাবিদ্যালয় এবং অন্তঃপুরিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা দেখিলেও বিশেষ ভরসা জন্মে না।[১]

বোঝাই যাচ্ছে, সেই সময়ে দাঁড়িয়েও মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুদিন আসেনি। বঙ্গমহিলা আদতে একটি বিদ্যালয়ের মুখপত্র হয়েও প্রধানত তাই জোর দিচ্ছে সেই

১। তদেব, ১-৫

সব অন্তঃপুরের মেয়েদের জন্য, যাতে তারা শিক্ষার আলো পেতে পারে। শুধু শিক্ষা দেওয়াতেই নয়, স্বাধীন ভাবে সাহিত্য রচনারও অবকাশ করে দিয়েছিল পত্রিকাটি। এই একই সংখ্যার ভূমিকাতে বলা হচ্ছে,

> আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, সুশিক্ষিতা রমণীগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ, তাঁহাদের রচনা এই পত্রিকাতে সাদরে গ্রহণ করিব।

শুধু এইখানেই তাঁরা থেমে থাকেননি, অন্যান্য যেসকল সম্পাদক তাঁদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করেছেন, বা ঈশ্বর গুপ্তের মত মানুষ যাঁরা ক্রমাগত নারীশিক্ষাকে ব্যঙ্গ করেছেন, তাঁদের মুখের উপর যোগ্য জবাব দিয়েই পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে,

> "সেই সকল রত্ন ও কুসুম উদ্ধার করিতে"। [১]

উনিশ শতকে একটি মহিলাদের পত্রিকা ভূমিকাতেই যে সাহসের পরিচয় দেয়, তা দেখে রীতিমত অবাক হতে হয়।

এখন আলোচ্য দুটি পত্রিকায় নজর দিলে শিক্ষা সম্বন্ধীয় বেশ কিছু লেখা চোখে পড়ে। যেমন- 'প্রাকৃত ভুগোলবিজ্ঞান', 'ভারতমাতা', 'মহারাষ্ট্রীয় জাতি', 'লর্ড ক্লাইবের আত্মহত্যা', 'স্ত্রীশিক্ষা', 'বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা', 'ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী' (বঙ্গমহিলা), 'জাতীয় মহাসমিতি', 'জাতীয় শিল্প ও ভারত মহিলা' 'প্রাচীন মিশরজাতির আচার ব্যবহার', 'আমাদের জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব', 'পরিবারে শিশুশিক্ষা', 'উচ্চ শিক্ষা', 'গুজরাটী বিদূষী মহিলাদ্বয়', 'ভারত মহিলার শিক্ষা'(অন্তঃপুর)। শিক্ষা সম্বন্ধীয় ইত্যাদি নানা বিষয়ে লেখা বিভিন্ন সময়ে এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হচ্ছে। এর থেকে আমরা পত্রিকা দুটির শিক্ষা দেওয়ার পরিধি সম্পর্কে খানিক আন্দাজ করতে পারি।

১। তদেব

উনিশ শতকে বারবার আলোচনা হয়েছে নারীশিক্ষার পাঠক্রম নিয়ে। নারীরা কতখানি শিখবে, কি কি শিখবে তা নিয়েও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি একাধিক মতামত দিয়েছেন।সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী দেখাচ্ছেন শুধুমাত্র রক্ষণশীল ব্যক্তিরাই নন, স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরাও বিভিন্ন সময়ে শিক্ষিত মেয়েদের ব্যবহারে কিছু একরকমের ত্রুটি পাচ্ছেন। 'বামাবোধিনী' বলছে,

> শিক্ষিত মহিলাদের নামে অভিযোগ প্রধানতঃ তিনটি- ১) তাঁহারা ইংরাজানুকরণপ্রিয়, ২) গৃহকর্মে অপটু, অতএব ৩) অপরিমিতব্যয়ী। অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ অমূলক নহে।[১]

আমরা দেখি – অন্তঃপুর এর ষষ্ঠ বর্ষে সম্পাদিকা হেমন্তকুমারী চৌধুরী লিখছেন,

> যে সতী সাধ্বী পতিব্রতা অশেষ গুণসম্পন্না রমণী ইংলন্দের রাজলক্ষী ও ভারতসাম্রাজ্ঞী রূপে জগতবিখ্যাতা হইয়াছেন, আমরা তাঁহারই পুত্যচরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি। [২]

এছাড়াও 'প্রাচীন ব্রিটন জাতি', 'আমাদের জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব' ইত্যাদি নানাবিধ প্রবন্ধ সেকালের শিক্ষিতাদের ব্রিটিশমুখীনতার প্রমাণ দিলেও তাঁরা গৃহকর্মে অপটু কিম্বা অপরিমিতব্যয়ী এমনটা কখনোই প্রমানিত হয় না। পরিচারিকা বিভিন্ন সময়ে বলেছে, স্ত্রীলোকের প্রধান কর্মক্ষেত্র তার পরিবার, সুতরাং পুরুষের উপযোগী শিক্ষা তাদের দিলে তা আসলে নারী প্রকৃতির বিপরীত হবে। এমনকি তারা এও বলছে, নারীত্বের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর থেকে অবশ্যই নারীপুরুষের শিক্ষা আলাদা হওয়া উচিত।পরিচারিকা ছিল ব্রাহ্মদের পত্রিকা, অথচ বারবার দাবী করেছে, নারীরা শারীরিক কারণে বুদ্ধিগ্রাহ্য পাঠ গ্রহণে

১। *বামাবোধিনী,* তদেব

২। শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী সম্পাদিত, *অন্তঃপুর ৬ ষ্ঠ বর্ষ, ১৩১০,* কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ক্রমিক সংখ্যা ৩৭, পৃষ্ঠাঃ ২৫

অক্ষম, তাই তাদের পুরুষদের মত শিক্ষালাভ উচিত নয়। এমনকি বামাবোধিনীও মার্কিন দেশের মেয়েদের ভগ্নস্বাস্থ্যের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছে, স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষার প্রণালী কখনোই এক হওয়া উচিত নয়। স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী নীলকণ্ঠ মজুমদার মনে করতেন বিদ্যাশিক্ষার ফলে মেয়েদের 'পুত্রপ্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস' পাবে। অন্যদিকে '*পরিচারিকা*'-র মত পত্রিকার দাবী ছিল বিদ্যাবতী নারী স্তন্যদানে অক্ষম।

একদিকে এইসব বিষয় নিয়ে যখন বারবার স্ত্রীশিক্ষাকে কাঠগড়ায় দাড় করানো হচ্ছে '*বঙ্গমহিলা*', '*অন্তঃপুর*' সমান্তরালে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। তাঁরা একদিকে যেমন '*বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব*' (প্রিয়ম্বদা দেবী, বি,এ) নিয়ে কথা বলছেন তেমনি বলছেন 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা'র কথা। তাঁরা বলছেন স্ত্রীলোকের জ্ঞানের প্রয়োজন থাকলে বিদ্যাশিক্ষার ও প্রয়োজন আছে, তাঁরা দাবী করেন যে এখন বালিকা সে একসময়ে জননী হবে তার উপর ভার আগামী প্রজন্মকে শিক্ষার আলো দেওয়া। তাঁরা প্রাচীনকালের বিদুষী নারীদের কথা উল্লেখ করে বলছেন আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা নতুন নয়, এর ভিত অনেক পুরনো। 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ' – বলছেন পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও পালন করতে হবে এবং শিক্ষা দিতে হবে। উনিশ শতকের পক্ষে এমন কথা নিঃসন্দেহে বাহবার দাবী রাখে। 'ভারত মহিলার শিক্ষা' প্রবন্ধে পাশ্চাত্যের শিক্ষা পদ্ধতির উদাহরণ দিয়ে বাঙালি মহিলাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। তাঁরা এও বলছেন প্রাচীনকালে শিক্ষিতা নারীরা পণ্ডিতদের সাথে শাস্ত্র আলোচনায় বসতেন।

উনিশ শতকে বারবার বলা হয়েছে স্ত্রী ও পুরুষের 'শারীরিক ও প্রবৃত্তিগত' পার্থক্যের কথা। বলা হয়েছে প্রকৃত শিক্ষার অর্থ মেয়েরা বোঝেনি এমনকি ব্রাহ্মরাও বারবার অভিযোগ

করেছে মেয়েদের কাছে শিক্ষার অর্থ সামান্য লিখতে পড়তে পারা, সেলাই এবং সামান্য গান গাইতে পারার ক্ষমতা। মেয়েদের ক্ষেত্রে অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞানের থেকেও বারবার শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মযুক্ত শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'বামাবোধিনী' অকুণ্ঠ ভাবে বলছে, ধর্মহীন শিক্ষার পরিবর্তে মেয়েদের মূর্খ থাকাও শ্রেয়। তাঁরা আরও দাবী করছে,

> কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সত্য কণ্ঠস্থ করিলে যে জ্ঞানবান হওয়া যায় তাহা নহে, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মভাব বিকশিত করা এবং সমুদয় জীবনের স্বাভাবিক উন্নতি সাধন করাই লেখাপড়ার প্রধান উদ্দেশ্য। [১]

অথচ এখানে আত্মপক্ষ স্বীকার করেও *'বঙ্গমহিলা'* নীতিমূলক শিক্ষার পক্ষে রায় দিচ্ছে না বরং একধাপ এগিয়ে সোচ্চারে *'স্ত্রীশিক্ষা'* প্রবন্ধে বলছে,

> বালিকারা এক্ষণে লেখাপড়া করিতেছে বটে;কিন্তু 'লেখা' 'পড়া' কথাদ্বয়ের শব্দার্থমাত্র সাধিত হইতেছে। বালিকারা লিখিতে ও রচনা করিতে পারে; পুস্তকাদি পাঠ, পঠিত পদসমূহের ব্যাখ্যা এবং কঠিন শব্দগুলির অর্থ ও বানান করিতে পারে; ব্যাকরণের কতকগুলি নিয়ম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে, হরণ পূরণ ত্রৈরাশিক প্রভৃতি অঙ্ক কসিতে এবং ভূগোল ইতিহাস ইত্যাদির কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে পারে; .....কিন্তু এই কয়েকটি বিষয়েই স্ত্রীশিক্ষা পর্যবসিত হইয়া থাকে।[২]

তাঁরা আরও বলছেন,

> শিক্ষা ও শিক্ষার ফল এই দুইটি পৃথক পৃথক পদার্থ। আমরা এক্ষণে শিক্ষামাত্র দেখিতেছি, উহার ফলের পরিচয় এ পর্যন্ত কিছুমাত্র পাই নাই। ..... বিশেষ উদ্দেশ্যর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই উদ্দেশ্য সাধন হওয়া সম্ভব। আমাদিগের

১। *বামাবোধিনী*, তদেব

২। *বঙ্গমহিলা*, তদেব

> শিক্ষাপ্রনালী উদ্দেশ্যশূন্য, সুতরাং কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিষ্ফল। ..... বিদ্যা অতি মনোরম ও ইষ্টজনক পদার্থ বটে, কিন্তু অল্প বিদ্যার বিপরীত ফল। এই অশুভ ঘটনাই আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কেবল বামাগনেরা কেন, পুরুষেরাও অধিকাংশ এ পর্যন্ত অল্প বিদ্যার অধিকারী। বাস্তবিক পুরুষদিগের অল্প বিদ্যা প্রযুক্তই স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতির এরূপ দুরবস্থা। [১]

নিজেদের ত্রুটি অকপটে স্বীকার করেও তাঁরা সমালোচনা করতে পিছপা হচ্ছেন না। নারী শিক্ষার ভালমন্দের দায়ভার সমান ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষদের ওপরেই দিচ্ছেন এবং একটি প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে এমন দাবী যে কতটা সাহসের পরিচায়ক তাও দেখিয়ে দিচ্ছেন।

অন্তঃপুরের একটি সংখ্যায় প্রসন্নময়ী দেবী 'উচ্চশিক্ষা' নামের প্রবন্ধ লিখছেন। সেখানে তিনি উচ্চশিক্ষা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের নীতির একপ্রকার সমালোচনা করছেন। বলছেন, সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা তখনই হবে যখন দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, অর্থনীতি, বাণিজ্য ইত্যাদি সবরকমের শিক্ষাই দেওয়া হবে। ব্রিটিশ নীতির যে মূল লক্ষ্য কেরানি তৈরি করা সেটি নিয়েও সমালোচনায় মুখর হচ্ছেন। বলছেন,

> শিক্ষা ভিন্ন কোন দেশের কোন জাতিই সমুন্নত হইতে পারে না।[২]

বলছেন শুধু সামাজিক না ব্যক্তির মানসিক বিকাশের জন্যও শিক্ষা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।শুধু শিক্ষা নয়, শিক্ষকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন। বলছেন অযোগ্য শিক্ষকদের অপসারণের কথা। তার পাশাপাশি সোচ্চারে বলছেন শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন। এর আগে যখন দেখলাম একদল বলছেন, শিক্ষিত নারী শুধুই ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ করেন, তাঁদের

১। *বঙ্গমহিলা*, তদেব

২। *অন্তঃপুর*, তদেব

মুখে এই প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে যোগ্য জবাব। এখানে ধরে ধরে তিনি ইংরেজদের তৈরি করা শিক্ষানীতির ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিচ্ছেন। অন্ধ ভক্ত হলে এই কাজটি কতখানি করতে পারতেন, তা আমরা প্রশ্ন তুলতেই পারি। উনিশ শতকের এক শিক্ষিত মহিলা সেই সময়ে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন এবং সেখানেই থেমে থাকছেন না, শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত, সেই বিষয়েও নিজের ভাবনা চিন্তা প্রকাশ করছেন, এটি সম্ভভপর হয়েছে শুধুমাত্র তিনি নিজে সুশিক্ষিত বলেই এবং এই পত্রিকাই তাঁকে এমন কথা প্রকাশের জায়গা করে দিয়েছে, সেটি ভুললেও চলে না।

একই সংখ্যায় শ্রীমতী মৃন্ময়ী সেন লিখছেন *'ভারত মহিলার শিক্ষা'* (প্রাচীন ও আধুনিক)। সেখানে ভারতের অতীতচারণ করছেন এবং দেখাচ্ছেন, এখন ইউরোপীয়রা শিক্ষায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে নিত্যনতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে,তাদেরকে আমরা সর্বাপেক্ষা সভ্যজাতি বলে সম্মান করছি। কিন্তু একসময় ভারত সভ্যতার সেই শিখরে ছিল। প্রাচীন ভারতীয়রা যে তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, তা একসময়ে সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। তিনি বলছেন, সেই সময়ে নারীরাও প্রকাশ্য সভায় নিজের জ্ঞান প্রদর্শন করতেন। তাই তিনি মনে করেন,

> শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা যদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্মালোচনা দ্বারা লুপ্তপ্রায় ধর্মভাব উদ্ধারার্থে নিজ নিজ জ্ঞান প্রয়োগ করেন, তবে আমাদের দেশে আবার সুদিন উপস্থিত হয়। কারণ সংসারে স্ত্রীলোকের ক্ষমতা বড় প্রবল।[১]

ইনিও শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকেননি। প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাসকেই স্মরণ করেছেন। তার সঙ্গে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন, নারীশিক্ষার প্রয়োজনের দিকটি। আমরা আলাদা করে লক্ষ্য করব শেষের বাক্যটি, যেখানে তিনি বলছেন,

---

১। *অন্তঃপুর*, তদেব

নারীর ক্ষমতা, তার শক্তির দিকটি। এই প্রসঙ্গে আমরা বেশ কয়েকটি কথা বলতে পারি। উনিশ শতকে বারবার বলা হয়েছে নারীর অক্ষমতার কথা। পুরুষদের মত নারী কর্মক্ষম নয়, তারা পুরুষদের অনুযায়ী পরিশ্রমে অপারগ এমন কথাও বারবার উঠে এসেছে। 'বেদব্যাস' পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১২৯৭ এর 'স্ত্রীস্বাধীনতা ও শিক্ষা' প্রবন্ধে বলা হচ্ছে, মহিলারা বাইরে বেরোলে এমন রোগ হতে পারে যা পুরুষদের হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

> মনে করুন, কোন রমণীর ঋতুর সময় জননেন্দ্রিয়ে হঠাৎ কোন শীতল বাতাস লাগিলে নানা গুরুতর ব্যাধি হইতে পারে, পুরুষের ঐরূপ শীতল বাতাসে কোন অসুখ নাও হইতে পারে।[১]

একুশ শতকে দাঁড়িয়ে এমন 'অদ্ভুত' যুক্তি আমাদের হাসির উদ্রেক করতে পারে কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সময়ে ক্রমাগত নারীর অধিকার, তাঁর স্বাধীনতা নিয়ে একের পর এক তর্ক হচ্ছে, সেই সময় এমন অবৈজ্ঞানিক, নেতিবাচক মন্তব্য মানুষের মনে বিতর্কের সৃষ্টিই করত। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন নারীর শারীরিক এই বিষয় নিয়ে উনিশ শতকের শেষের দিকে নারীশিক্ষার সমর্থক এবং বিরোধী উভয়ই নারীশিক্ষার বিরুদ্ধতা করতেন। বলাই বাহুল্য এমন নেতিবাচক মন্তব্যের ফল কখনোই ভালো হতে পারে না। 'নব্যভারত' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম এবং নারীশিক্ষার সমর্থক, তা সত্ত্বেও তাঁর পত্রিকায় নারীশিক্ষার বিরুদ্ধতায় বলা হয়েছিল,

> স্তন থাকা বশতঃ স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা অধিক ভাবপ্রবণ(emotional)।[১]

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শনের পাঠক তথাকথিত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর এমন মন্তব্য নিঃসন্দেহে আমাদের অবাক করে দেয়।বলা হয়, "তীক্ষ্ণ জ্ঞানালোচনা স্ত্রীজাতির পক্ষে খাটে না"। এমন কথা যখন উঠছে এবং রীতিমত বহু মান্যগন্য মানুষের সমর্থনে পুষ্ট হচ্ছে, সেই সময়ে মৃন্ময়ী

১। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, তদেব

২। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, তদেব

দেবী তাঁর লেখার মাধ্যমে নারীত্বের ক্ষমতার কথা বলে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন, এবং এই ক্ষমতা যে কেবল শিক্ষাই দিতে পারে, তা স্পষ্ট করতেও ভুলছেন না। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কালের বিপরীতে এমন কথা ছাপার কৃতিত্বও পত্রিকাকেই দিতে হয়।

বঙ্গমহিলার ১২৮২এর প্রথম সংখ্যায় 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। যেখানে বলা হচ্ছে প্রাচীনকালে স্ত্রীরা সমাজে পুরুষদের মতই উপস্থিত থাকত এবং তারা কখনোই অন্তঃপুরের চার দেওয়ালে বন্দি ছিল না। বলা হচ্ছে, পুরুষ-নারী এই পার্থক্য সাধারণত পিতা-মাতারাই করে থাকেন, এই কাজটির নিন্দা করা হচ্ছে।

> পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করান এবং সাংসারিক কার্যের ভার গ্রহণে পারদর্শী করা পিতামাতার পক্ষে যেমন উচিত, কন্যার প্রতিও তদ্রূপ আচরণ সমতুল্য রূপে যুক্তিযুক্ত।[২]

নারী পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে আমরা একুশ শতকে দাঁড়িয়েও যখন প্রতিনিয়ত লড়াই করি তার প্রায় একশ বছরেরও বেশি সময় আগের এক পত্রিকা নারী পুরুষের সমান অধিকার, সমান শিক্ষার দাবী করছে, তা রোমাঞ্চ তৈরি করে বইকি। প্রথাগত শিক্ষালাভ করে শুধু চাকরি পাওয়া না, শিক্ষার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করছে। 'বিদ্যাভ্যাস', 'মনোবৃত্তির উৎকর্ষণ', 'প্রবৃত্তি সমূহের সংস্করণ', 'ধর্মানুরাগ সংস্থাপন', 'রিপুদলের শাসন' ইত্যাদি প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং তা আসলে নারী-পুরুষ উভয়েরই শেখা উচিত, এমন সিদ্ধান্ত জানাতেও পিছপা হচ্ছে না। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার না হওয়া এবং স্ত্রীজাতির পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে অনায়াসে তুলে ধরছে, পুরুষরা নিজেদের সুবিধার্থে এবং প্রভুত্বকে বজায় রাখতেই আসলে স্ত্রীদের হীন জাতি করে রেখেছে। উনিশ শতকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে এমন কথা আমাদের

১। বঙ্গমহিলা, তদেব

পরবর্তীকালের 'ফেমিনিসম' তত্ত্বকে যেন মনে করিয়ে দেয়। সেই সময়ের নিরিখে এমন স্পষ্ট কথা তাঁদের অকুতোভয় মনকেই চিনে নিতে সাহায্য করে।

তেমনই দেখি অন্তঃপুরে ১৩০৯ সংখ্যায় ছাপা হচ্ছে, শরৎকুমারী চৌধুরীর লেখা *'একাল ও একালের মেয়ে'* প্রবন্ধটি। বাঙালি স্ত্রীর শিক্ষা, তার গতিবিধি যে বাঙালি পুরুষের রুচি ও অভিপ্রায় মেনেই হয়েছিল, তা লেখিকা আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এতদিন ধরে এমন কথা অনেকবার পাই, যেখানে নারী শিক্ষার বিরোধীরা বলে নারী বেশি শিক্ষিত হলে বিধবা হয়। বস্তুত এরকম সংস্কার যে বাঙালি মনে জাঁকিয়ে বসেছিল, তার প্রমাণ আমরা রাসসুন্দরীর লেখায় ও পেয়েছি। সেইখানে সম্পূর্ণ স্রোতের বিপরীতে গিয়ে লেখিকা বলেন,

> শিক্ষার অভাবে একটা বৈধব্য-জীবনে যে শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। [১]

এখানে তিনি একটি গল্প বলেন, এক বিধবা মেয়ের গল্প,স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় বিধবা কি করে ধীরে ধীরে সমাজ থেকে প্রতারিত হতে হতে ক্রমশ হারিয়ে যায়, সেই কথাই বলেছেন এবং গল্প বলাতেই থেমে না থেকে তার এই পরিনতির কারণ অনুধাবন করেছেন।

> এই তো আমাদের সমাজের অবস্থা!এই তো আমাদের সমাজের বিচার! সেই হতভাগিনী বিধবা অসহায়া পতিতা বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। আর অশিক্ষিতা অসহায়া রমণীর অধঃপতনের মূল যে পুরুষ, তিনি সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া সমাজের দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া সুখভোগ করিতে লাগিলেন।[২]

১। *অন্তঃপুর* , তদেব

২। ঐ

উনিশ শতকের এক নারী সমাজের ক্ষমতাশালী দের উদ্দেশ্যে এমন অভিযোগ আনতে পারেন কিম্বা পতিতা এক রমণীর দোষ না দেখে তার অবস্থার জন্য পুরুষজাতিকে দায়ী করতে পারেন, এমন ভাবনা তো আমরা এর আগে দেখিনি। শিক্ষিত মহিলারা শিক্ষা গ্রহণে যুক্তিবাদী হয়ে উঠছিলেন। একমাত্র শিক্ষাই পারে, অন্দরের অন্ধকার ঘুচিয়ে নতুন আলোর সন্ধান দিতে, এই বোধ উনিশ শতকের নারীর মনে ক্রমশ জায়গা করে নিতে দেখি।

বামাবোধিনী, অন্তঃপুর, বঙ্গমহিলা –তিনটি পত্রিকাই ছিল মূলত ব্রাহ্মদের দ্বারা পরিচালিত। তবু সময়ের নিরিখে দেখি অন্তঃপুর, বঙ্গমহিলা বারবার পুরুষদের অন্যায় অধিকারের কথা অকপটে বলেছে। সময়ের থেকে তাঁদের অনেক লেখাই অনেক এগিয়ে ছিল। রাজবালা দেবী যেমন বঙ্গমহিলা তে (১২৮২) লেখেন, "জেনানাতে আমাদের পশুর মত বন্ধ করে রাখা হয়"। লেখায় যেন বহুকালের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, অভিযোগ প্রকাশ পায়। প্রবন্ধগুলির যুক্তিনির্মাণও ছিল নিটোল। কৈলাসবাসিনী দেবী প্রশ্ন করেন,

> পুরুষরা মেয়েদের শিক্ষিত করিতে ভয় পায়.....পাছে মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে যায়, তাই কি মেয়েদের অন্তঃপুরে বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা?[১]

উনিশ শতকের নারীর মুখে এমন কথা ভাবাই যায় না। উত্তরা চক্রবর্তী 'নারীপ্রগতির নিখিলভুবন' এ কৈলাসবাসিনী দেবীর অপর একটি সাহসিকতার কাজ তুলে ধরেন, যেখানে কৈলাসবাসিনী নিজে ব্রাহ্ম হয়েও স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করার জন্যও লক্ষী-নারায়ণের পূজা করেন।

> আমি হিন্দুত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমি স্বামীকে তা বলিব না। আমি জানি আমার উক্তিতে আমার স্বামী খুশী হইবেন। কিন্তু আমি

১। *বঙ্গমহিলা*, তদেব

> তাঁকে সে সন্তুষ্টি দিব না। উপরন্তু হিন্দু ভজনে পূজনে উনি যদি অসন্তুষ্ট হন, আমি অপারগ হইব।[২]

কৈলাসবাসিনীর এই লেখা সেযুগেও নারীর সাহসের পরিচায়ক। পুরুষের সব কথা মানতে, মাথা নিচু করে থাকতে আর রাজি নয় বঙ্গমহিলারা। একমাত্র দেখি ১৮৯১ এ বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে তাঁরা স্বজনহারানোর বেদনা অনুভব করেন।

তবে শুধু কি অগ্রসরতার কথাই পাই?মহিলারা ক্রমশ আত্মসচেতন হয়ে উঠছিলেন একথা ঠিকই। কিন্তু সমকালে যখন বেশিরভাগ মানুষ স্ত্রীশিক্ষার, স্ত্রীস্বাধীনতার কুফলগুলিকে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিলেন, সেইরকম সময়ে কি মহিলারাও কখনও সেই বিশ্বাস এর কাছে নতিস্বীকার করেননি! দেখব,

অন্তঃপুর পত্রিকার ১৩১০ এর সংখ্যায়, শ্রীমতী সুবাসিনী সেহানবিশ , *'আমাদের জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব'* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এখানে তিনি বলছেন, পাশ্চাত্যের মত স্ত্রীশিক্ষা আমাদের দেশে কখনোই প্রচলিত হতে পারে না। এবং এই শিক্ষার ফলেই স্ত্রীজাতির অবনতি ঘটছে।বলছেন, "স্ত্রী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক নহে।" সংসার প্রতিপালনই নারীজাতির কর্তব্য, তাই সেই কাজ যাতে নির্বিঘ্নে হতে পারে এমন শিক্ষাই মেয়েদের দেওয়া প্রয়োজন। বলছেন, আধুনিকা মহিলারা পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে স্কুল-কলেজে গিয়ে 'মেম' সেজে আসলে অধঃপতনের দিকেই যাচ্ছে। একই সঙ্গে নিজের হয়ে সাফাই দেওয়ার সুরে বলছেন,

> কোন পাঠিকা ভগিনী ইহাতে যেন আমাকে স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী বলিয়া মনে না করেন। [১]

২। উত্তরা চক্রবর্তী, তদেব

১। *অন্তঃপুর* , তদেব

অর্থাৎ তিনি নিজেও নিশ্চিত এই কথায় তাঁকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী আখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। তা সত্ত্বেও তিনি প্রাচীন ভারতের সতী নারী, সীতা, সাবিত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করারই উপদেশ দিচ্ছেন। আশ্চর্য লাগে, যে পত্রিকায় মহিলারা প্রতিনিয়ত নারী শিক্ষার প্রকল্প, তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বারবার সোচ্চার হচ্ছেন, সেই একই পত্রিকায় এমন লেখাও প্রকাশিত হচ্ছে।এই লেখাটি আমাদের মনে করায়, মাঘ, ১৩০৪ এ *'মহিলা'* পত্রিকায় প্রকাশিত, *'নারী জাতির কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত'* প্রবন্ধের কথা। যেখানে বলা হয়েছিল পুরুষদের মত মহিলারাও বিজ্ঞান, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাসবিদ্যা, সাহিত্যতত্ত্ব পড়ে বড় বড় উপাধি লাভ করবে এমন ভাবাই "নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ"। আবার *'পরিচারিকা'* তার আশ্বিন, ১২৮৯ এর *'বেনীবাবুর প্রত্যাবর্তন'* এ বলেছিল, কঠিন অঙ্ক ও বিজ্ঞান পাঠ করার ফলে কিছু মেয়ে নাকি ক্ষয়রোগে মারা গেছে। আবার কারোর কারোর ম্যালেরিয়া অব্দি হয়েছে। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধটিও তো এদের সাথেই গলা মিলিয়ে বলে, পুরুষের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতায় গিয়ে, অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা নারীর পক্ষে অনুচিত।বারবার বলছে, নারীকে তার 'আদর্শ গৃহিণী'র পদ লাভ করতে হবে। তার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু শেখাই বাঞ্ছনীয়। ।

অন্তঃপুরে ১৩০৯ সংখ্যায় শরৎকুমারী চৌধুরীর লেখা *'একাল ও একালের মেয়ে'* প্রবন্ধটিকে সেই সময়ের নিরিখে অগ্রসর বলা যায় ঠিকই। কিন্তু কয়েকটি কথা আমাদের ভাবায়, তিনি বারবার বিধবাদের শিক্ষাদানের কথা বলছেন, প্রকৃত শিক্ষার অভাবই বিধবাদের দুঃখের কারণ এমন বলতেও দ্বিধা করেননি। তবে নারীদের প্রকৃত শিক্ষা বলতে তিনি কি বলতে চেয়েছেন, সেটিও স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। সমাজে বেশিরভাগ মহিলারা যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তা প্রকৃত শিক্ষা নয়, একধাপ এগিয়ে আরও বলছেন, সধবা ও বিধবা নারীর শিক্ষার স্বরূপ হবে আলাদা।

> ধর্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ দুর্লভ বলিয়া তাহারা সহজলব্ধ আশু তৃপ্তিকর কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস ও নাটক সর্বদা পাঠ করিয়া থাকে।.....ইহাতে তাহাদের মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি হইয়া পরিণামে দুঃখদায়ক হয়, ইহার কি কোন প্রতিকার করিতে পারা যায় না?[১]

অর্থাৎ এখানেও তো বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, নারী কতটা শিখবে আর কতটা শিখবে না, বা শিখে কি করবে এবং কি করবে না। অদ্ভুত ভাবে এখানে এসে মিলে যায়, নারীশিক্ষার সমর্থক ও বিরোধীদের মতটি। এই লেখাটি একমাত্র নয়, বঙ্গমহিলা এবং অন্তঃপুরের পাতায় এমন মত আমরা অনেক পাবো, যেখানে মহিলারাই বলছেন তাঁদের শিক্ষার কুফলগুলি কি কি। বঙ্গমহিলার 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধ একদিকে যেমন নারীশিক্ষার প্রয়োজনের কথা বলছে, একইসঙ্গে বলছে এই শিক্ষা নিয়ে তাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মান রাখা এবং তাদের যত্ন করা উচিত। স্ত্রীলোকের প্রধান কর্তব্য যে সংসার প্রতিপালন করা এই কথাটি শিক্ষিত মহিলারাও স্বীকার করছেন। অথচ এই মহিলাদের শিক্ষার প্রথম স্তরেই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, নারী শিক্ষা পেলে আর ঘরে পুরুষের বাধ্য হয়ে থাকবে না। তারা সংসারকে অবহেলা করবে, অথচ সেইরকম কথা তো কোন শিক্ষিত মহিলাই বলছেন না। বরং মহিলাদের কাছে সংসারের মাহাত্ম্যই প্রকাশ করছেন।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বারবার উদাত্ত কণ্ঠে বলেছে, মহিলাদের ধর্মযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার কথা। যেমন বামাবোধিনী, ১২৮০ তে প্রকাশ করে, 'স্ত্রীগণের ধর্মহীন শিক্ষা সমুচিত কি না' প্রবন্ধটি, এবং সেখানে বলে,

---

১। *অন্তঃপুর* , তদেব

> স্ত্রীগণ যদি প্রথম হইতে ধর্মে দীক্ষিত না হন, যদি বিকৃত শিক্ষা বলে তাঁহাদিগের ধর্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়, সমাজের কি ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। [১]

ধর্মশিক্ষার উপর এই অযথা নির্ভরশীলতা তো সেই সময়ের পুরুষদের মেয়েদের স্বাধীনতার অপপ্রয়োগের ভয়েই। একটি বিশ্বাস জোরালো ছিল যে শিক্ষা আনে স্বাধীনতা এবং তা স্ত্রীশিক্ষা হলে তার পরবর্তী ধাপ হবে স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা। ব্রাহ্মরা ছিল অনেকাংশে উদার, অগ্রসর, অথচ ব্রাহ্ম সভার মুখপত্র *'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'* ১৮০০শকে, *'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বধীনতা'* প্রবন্ধে বলে,

> স্বামী কার্যপলক্ষে বাহিরে ছিলেন, আসিয়া দেখিলেন তাহার স্ত্রী কোন পুংবন্ধুর সহিত নির্জনে স্বৈরালাপ করিতেছেন [১]

তাহলে কি শিক্ষিত পুরুষ ভয় পাচ্ছে, নারী শিক্ষিতা, স্বাধীনচেতা হয়ে উঠলে আর পরিবারের চার দেওয়ালের বিধিনিষেধের মধ্যে থাকবে না, তাই কি শিক্ষার পরিধি বেঁধে দেওয়ার এমন প্রচেষ্টা, প্রশ্নটি আমাদের মনে থেকেই যায়। ঠিক যেমন মনে হয়, যে ব্রাহ্মরা নারীশিক্ষা, নারীস্বধীনতা নিয়ে এত ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাঁরাও শেষ অব্দি কেন নারীর শিক্ষার এমন ক্ষতির আশঙ্কা করছেন! সমকালের দাবী মেনে তাঁদের 'প্রগতিবাদী' ধারণাও যে আসলে খুবই সীমিত ছিল, এই সিদ্ধান্তে আসাই যায়!

পূর্বে আলোচিত *'ভারত মহিলার শিক্ষা'* প্রবন্ধেও বলা হচ্ছে, আধুনিক নারী অল্প বিদ্যা অর্জন করে এবং সেই জ্ঞানের অসদ্ব্যবহার করে। অভিযোগ করা হচ্ছে, "স্ত্রীলোকেরা সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া কুৎসিত উপন্যাস পাঠ" করে জ্ঞানের অপচয় করে।ধরে নেওয়াই যায়, জ্ঞান

১। *বামাবোধিনী*, তদেব

১। স্বপন বসু, তদেব

যদি সংসারের কাজে, সন্তান প্রতিপালনের কাজে লাগে, তাহলে তা ব্যর্থ বলে ভাবা হবে না। অন্তঃপুর পত্রিকার ১৩০৯ সংখ্যায় প্রবাসিনী দেবীর 'দৈবের তামাশা' লেখায় দেখানো হয় মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কিভাবে প্রেমের প্রতি আকুল হয়ে পড়ছে। তিনটি নারী চরিত্র এরপর একে অপরকে বলে, "আয় ভাই আমরা প্রেম প্রেম খেলি"।

শুধু প্রেমের প্রতি আকুলতাই নয়, নারী শিক্ষার অপর খারাপ দিক বেশি বেশি নাটক, নভেল পড়ে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্করহিত হয়ে কল্পনারাজ্যে বিচরণ করা। সেই সময়ে অমৃতলাল বসুর লেখা *'বৌমা'* নাটকে দেখানো হয়, শিক্ষিতা বউ তার শাশুড়িকে রান্নাঘরে না যাওয়ার যুক্তি স্বরূপ তার পাঠ্য উপন্যাসের মহিলা চরিত্রদের কথা বলছে, (তিলোত্তমা, মৃণালিনী, মনোরমা, ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী প্রমুখ), তার দাবী এরাও কোনোদিন রান্নাঘরে যায়নি। এইসব ব্যঙ্গবিদ্রুপাত্মক লেখা সেই সময়ে শিক্ষিত মেয়েদের উদ্দেশ্যে হামেশাই লেখা হত।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা তার নিজের চারিত্রিক উন্নতির জন্য নয়, তার চাহিদা পূরণের জন্যও নয়, নারীর শিক্ষা তখনই কাম্য এবং সম্পূর্ণ যখন তা পরিবারের চাহিদা পূরণ করবে। নারীশিক্ষা নিয়ে এত জোরালো কথা বলেও শিক্ষার প্রয়োগের ক্ষেত্রটি তখনও পরিবার কেন্দ্রিকই রয়ে যায়। তার থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্রতার দাবী জানাতে পারে না। তবে শুধু উনিশ শতককে দোষ দেওয়া যায় কি! একুশ শতকের বর্তমান সময়ে আমরা বাংলা ভাষায় যে সকল মহিলাদের পত্রিকা দেখি তারাও কি একই কথা বলে না? *'সানন্দা'*, *'সুখী গৃহকোণ'*, *'প্রথমা'*, *'অদ্বিতীয়া'* ইত্যাদি পত্রিকার পাতা ওলটালেও তো দেখি সংসার সামলানো, বাচ্চা মানুষ করা, শ্বশুর বাড়িকে খুশি রাখা, ঘর গোছানোর অজস্র ছোট বড় টিপস। তবে উনিশ শতকের সেই ধারা যে এখনো চলছে না, তা কি আদৌ জোর দিয়ে বলা যায়!

বঙ্গমহিলা ও অন্তঃপুর এ একদিকে যেমন নারীর শিক্ষা, তার পরিধি নিয়ে বিস্তর তর্কবিতর্ক হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে এই পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নারীকে শেখানো হয়েছে।আশ্চর্য লাগে তাঁদের বিষয় নির্বাচনের পরিধি দেখে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজ, নারীর স্বাস্থ্য, পুরাণ, পরিবেশ, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁরা তাঁদের পাঠিকাদের শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। যে সময়ে দাঁড়িয়ে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে মহিলারা কতটুকু শিখবেন তাঁদের পাঠ্যক্রম নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, সেই সময়ে এই পত্রিকাদুটির সহজ স্বাভাবিক শিক্ষা দানের পদ্ধতিটি অবশ্যই নজর টানে।

অন্তঃপুরের পঞ্চম বর্ষের সংখ্যায় ছাপা হচ্ছে, *'গুজরাটি বিদুষী মহিলাদ্বয়'* প্রবন্ধটি। এইখানে দেখানো হচ্ছে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুজন ভারতীয় মহিলার বি,এ পাশের কথা। তাঁরা আসলে আর,বি, ভোলানাথ সারাভাই এর আত্মীয়া। আর,বি, ভোলানাথ সারাভাই কে, তা জানাতেও ভুলছেন না। তিনি যে বিখ্যাত সমাজসংস্কারক এবং স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক তাও পাঠিকাদের জানানো হচ্ছে। শুধুমাত্র বইতে পড়া জ্ঞান না, সমকালে দেশে কোথায় কি হচ্ছে, অন্যান্য প্রদেশের মহিলারা কি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন, তাও নিয়মিত জানিয়ে পাঠিকাদের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত করে তোলার ভার নিচ্ছে পত্রিকা। শুধু এটুকুই নয়, আসামে কটন সাহেবের উন্নতির কথাও বলা হচ্ছে, কারণ তিনিও স্ত্রীশিক্ষার হিতৈষী। এরই সঙ্গে বলছেন, মিশর দেশ কিভাবে আতস কাঁচের সাহায্যে উত্তাপ ধরে তা দিয়ে রান্না করার উপক্রম করছে। বঙ্গমহিলারাও এইভাবে নিজেদের পরিশ্রম লঘু করবেন এই তাঁদের আশা। এবং এই তাপ শক্তি দিয়েই রেলগাড়ি চলবে তা জানাতেও ভুলছেন না। উনিশ শতকের নারী যাতে দেশ-বিদেশের অগ্রগতির কথা জেনে নিজেরাও উৎসাহিত হয়, এই তাঁদের লক্ষ্য।

স্ত্রীশিক্ষাকে একটি গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখার পক্ষপাতী যে তাঁরা নন, এই লেখা তাইই প্রকাশ করে।

এই একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় *'জাতীয় মহাসমিতি'* বিষয়ে প্রবন্ধ। এই সমিতিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্ব পদ বরণ থেকে সভার কাজের সুচী, উদ্দেশ্য, গণ্যমান্য মানুষের বক্তব্যের সারাংশ সবই উঠে এসেছে এই লেখায়। পত্রিকা যদি কেবল নারীর একমুখী শিক্ষায় বিশ্বাসী হত, তাহলে এই সকল তথ্য জানানোর প্রয়োজন ছিল না। অন্তঃপুরে বসেও যাতে নারী দেশের দশের বিভিন্ন খবরাখবর রাখতে পারে, সেই চেষ্টায় বরাবর পত্রিকা উদ্যোগী হয়েছে।

ঠিক যেমন বঙ্গমহিলাতে ছাপা হচ্ছে, 'ইংলণ্ডের শাসন- প্রণালী', 'কলিকাতার লোকসংখ্যা' সম্বন্ধীয় তথ্য। 'ইংলণ্ডের শাসন- প্রণালী' প্রবন্ধে ইংলণ্ডের ইতিহাস, তাদের সমাজ, নারী-পুরুষের অবস্থান, তাদের পার্লামেন্টের গঠন সবই বলা হয়েছে। তেমনই 'কলিকাতার লোকসংখ্যা' তে বলা হচ্ছে, কলকাতায় কতজন বসবাস করে, তাদের মধ্যে মহিলা পুরুষের অনুপাত। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সধবা, বিধবা দের সংখ্যাও জানানো হচ্ছে। শুধু সংখ্যা তত্ত্ব জানানো নয়, এর মাধ্যমে বঙ্গের সামাজিক চিত্রটিও তো উঠে আসে। নারী সমাজের বাস্তব ছবি, শিক্ষিত মহিলা, বৈধব্যের যন্ত্রণা সহ্য করা মহিলার সংখ্যা কত, তাও বঙ্গনারী জানতে পারছে। হয়ত তাদের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করাই ছিল এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, যাতে মহিলারা তাদের সমগোত্রীয় ভগিনীগণের দুঃখে সামিল হয়ে তা মোচনের কাজে ব্রতী হতে পারেন। উদ্দেশ্য যাই থাকুক, সেকালে এই শিক্ষাদানের পদ্ধতি যে বেশ আলাদা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উক্ত প্রবন্ধের ছকটি তুলে দিলে বিষয়টি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়,-

পুরুষদের মধ্যে,

বিবাহিত	অবিবাহিত	স্ত্রীহীন
১৮০,৪৭৮	৮৬,১৬৬	১৩,৪৭৬

নারীদের মধ্যে,

বিবাহিতা	অবিবাহিতা	বিধবা
৫৮৯৭৭	২৯৩৮০	৫৫৪৮৩

তার সাথে বলা হচ্ছে, যেখানে প্রতি ১০০ জন পুরুষের মধ্যে ৪২ জন লেখাপড়া জানে, নারীদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি, প্রতি ১০০ জনে মাত্র ৩ জন। এর থেকে তাঁরা নারী শিক্ষার বাস্তব ছবিটি তুলে ধরে আসলে তাদের অতি কম উন্নতির দিকেই দৃষ্টিপাত করাচ্ছেন।

এছাড়াও বঙ্গমহিলা, অন্তঃপুর এর বিভিন্ন সংখ্যায় তাঁরা নারীদের ভারতের ইতিহাস, পুরাণের গল্প শিক্ষা দিয়েছেন। লিঙ্গপরিচয়ের থেকেও ভারতবাসী হিসেবে তাঁরা যে সুপ্রাচীন ও মহৎ ঐতিহ্যের অধিকারী, যেখানে এক কালে লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনার মত পণ্ডিত নারীদের উত্তরাধিকার তাঁরা বহন করছেন, এই মূলটি চেনানোর প্রচেষ্টা তাদের উন্নত মানসিকতারই পরিচয় বহন করে।

এই তো গেল পত্রিকা দুটির শিক্ষা বিষয়ে নানা দিকের কথা। আর একটি বিষয় যা এই দুটি পত্রিকায় বারবার উঠে এসেছে, তা হল, স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ। উনিশ শতকে শিক্ষিতা নারীর স্বাস্থ্য নিয়ে বিরোধীরা যে একটু বেশিই তৎপর হয়ে উঠেছিলেন, তা আমরা এর আগেও উল্লেখ

করেছি। শুধু বিরোধীরাই নয়, মহিলাদের অন্যান্য পত্রিকাও তো বলেছে, অধিক শিক্ষা গ্রহণে নারীর নারীত্ব নষ্ট হয়। ১২৭৯ তে বামাবোধিনী, *'স্ত্রীজাতির বিশেষ শিক্ষা'* লেখায় বলে,

> স্ত্রীজাতির প্রকৃতি কোমল, এই জন্য সুকুমার বিদ্যা তাহাদিগের প্রকৃতির বিশেষ উপযোগী।[১]

বলা হয়েছে, অতিরিক্ত কঠিন বিদ্যাগ্রহনে নারী স্তন্যদানে অক্ষম হয়। এখান থেকে আমরা বলতে পারি, উনিশ শতকের বাঙালি পুরুষের কাছে নারীর স্বাস্থ্য এত কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল? তাঁরা কি সত্যি শুধু নারীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত ছিলেন? এমনটা পুরোপুরি বলা যায় না। নারীর প্রয়োজন ছিল, সংসার সামলানো, সন্তান ধারণ এবং তাদের প্রতিপালনে। এই কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য আবশ্যক শিক্ষাটুকু পেলেই হল। ভুলে গেলে চলবে না, মাতৃত্ব যে নারীসত্তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তা এখনো মনে করা হয়, সুতরাং উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় পুরুষ যে এই ভাবনার অন্যরূপ চিন্তা করবেন না তা তো বলাই বাহুল্য। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর *'পুরাতনী'* তে তিনি বলেন, সেকালের ঠাকুর পরিবারের কথা। মহর্ষির স্ত্রী শ্রীমতী সারদা দেবীর কথা। জানা যায়, প্রায় প্রত্যেক বছর তিনি সন্তানের জন্ম দিতেন। এবং তাঁর স্বাস্থ্য যে এর থেকে অনেকটাই ভেঙে পড়েছিল, একথার উল্লেখ ও আমরা অনেক পাই। শিক্ষা, আধুনিকতার পীঠস্থান খোদ ঠাকুরপরিবারের চিত্রই যদি এমন হয়, তাহলে অন্যান্য পরিবারে নারীর অবস্থাটি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। রাসসুন্দরী তাঁর *'আমার জীবন'* এ লিখেছিলেন, প্রতি বছর তাঁর সন্তান জন্ম দেওয়ার কথা এবং তাদের লালন-পালনে নিজের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলার কথা। সারাদিনের কাজের পর তিনি যখন খেতে বসতেন, ঠিক সেই সময়ে কোন শিশু

১। *বামাবোধিনী*, তদেব

আচমকা জেগে যেত, তাঁর আর খাওয়া হত না। আমরা প্রশ্ন তুলতেই পারি, এই পরিমাণ অযত্ন, অবহেলা, পরিশ্রমে নারী শরীরের ক্ষতির কথা তো কোনও পুরুষ ভাবেননি। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েরা (সাধারণত, ৬-৮ বছরের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত,জ্ঞানদানন্দিনীর বিয়ে হয় সাত বছর বয়সে, সারদা দেবীর বিয়ে হয়েছিল ছয় বছর বয়সে, গৌরীদানের পুণ্যই লাভ হত ৮ বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিলে) , ঋতুমতী হওয়ার পরেই সন্তানের জন্ম দিত। ১৮৯২ সালে ১০ বছরের বালিকা ফুলমনি দাসী, সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেলে, সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে দেশে কলরব উঠেছিল। কিন্তু সহবাস আইন বলবত হওয়ার পরেও সমীক্ষায় দেখা যায়, মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়াতে হিন্দু পরিবারে আপত্তি ছিল, তার পাশাপাশি তো ছিলই ব্রাহ্মণ ধর্মের কর্তাদের একঘরে করে দেওয়ার ভয়। ফলে নারীর স্বাস্থ্যের দিকটি থেকে গেছে অন্ধকারেই।

পত্রিকায় দেখব নারীর স্বাস্থ্য নিয়ে বেশ কিছু কথা হচ্ছে।–

অন্তঃপুরে প্রকাশিত হচ্ছে, *‘স্ত্রীরোগ’* নামের প্রবন্ধ। যেখানে সরাসরি মেয়েদের ঋতুকালীন অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

> যদ্যপি রীতিমত ঋতু- শোণিত নির্গত না হয় ও তাহার সহিত তলপেটে বেদনা ও যন্ত্রণা থাকে এবং তজ্জন্য গর্ভের প্রতিবন্ধকতা ঘটে, তবে সাধারণতঃ সেই ঋতুকে বাধক ঋতু ও তাহার বেদনাকে বাধকের বেদনা বলা হয়।[১]

আমরা এই উক্তির যথার্থতা, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করব না। আমরা লক্ষ্য করব, উনিশ শতকের সূচনাতেও যখন সমাজে ভালভাবেই অবরোধ প্রথা চালু ছিল, সেই সময় থেকে সরে এসে উনিশের শেষ এবং কুড়ির শুরুতে দাঁড়িয়ে বঙ্গীয় মহিলা প্রকাশ্যে

১। *অন্তঃপুর*, তদেব

মেয়েদের ঋতু নিয়ে কথা বলছে। স্ত্রীরোগ, বিশেষ করে ঋতু সম্বন্ধীয় কথা স্ত্রীজাতিকে গোপন, লজ্জার বিষয় হিসেবেই সেখান হয়েছে। সেইরকম সময়ে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা প্রকাশ্যে এই ট্যাবু ভাঙছেন এবং একটি পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হচ্ছে, এটি অভাবনীয় বলেই মনে হয়। শিক্ষা যে নারীর মনের অন্ধবিশ্বাসকে ভেঙে, লজ্জা অতিক্রম করে যুক্তিপূর্ণ ভাবে ভাবতে শেখাচ্ছিল এর থেকে বড় প্রমাণ আর কিই বা হতে পারে।

এই একই সংখ্যায় দেখব অপর একটি প্রবন্ধ, 'সূতিকাগারে প্রসূতির শুশ্রূষা'। এখানে বলা হচ্ছে, প্রসূতি নারীর প্রসবের আগে ও পরের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য গুলি। চিত্রা দেবের 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' থেকে জানা যায়, সেইকালে ঠাকুর বাড়ির সূতিকাগৃহ টিও অবহেলার ছিল। বেশিরভাগ পরিবারেরই এমন দশা। ফলে মা ও শিশুর পদে পদে জীবনের বিপর্যয় হত। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে, প্রসূতি গৃহ যথেষ্ট পরিমাণে খোলা, জীবাণুমুক্ত করার পরামর্শ দিচ্ছে প্রবন্ধটি। আগে পরে নারী ও তার সদ্যোজাত সন্তানের সেবা কেমন হবে তাও বলে দিচ্ছে। নারী ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরছে তা তো বলাই যায়।

বঙ্গমহিলা *'স্বাস্থ্য রক্ষা'* প্রবন্ধে বলছে, মানুষের শরীর সর্বাধিক দামী। তাই একে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা যায়। যদিও এখানে আলাদা করে নারীর স্বাস্থ্যের কথা বলা হয়নি, তবু আমরা ধরে নিতে পারি, যেহেতু পত্রিকাটি মহিলাদের উদ্দেশ্য করেই প্রকাশিত তাই এই শিক্ষা আসলে মহিলাদের দেওয়ার জন্যই।এই প্রবন্ধেই বলা হচ্ছে, স্বাস্থ্য রাখার জন্য কি কি খাওয়া উচিত। ধরে নেওয়া যায়, সেকালের অন্দরের মহিলাকে নিজের সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়াসেই এমন বিষয়ের অবতারণা।

অন্তঃপুরেরই একটি সংখ্যায় বলা হয়েছে, নারী শিক্ষিত হলে সে পরিবারের স্বাস্থ্যেরও যত্ন নিতে পারবে। সেই সময়ে চিকিৎসক এত সহজলভ্য ছিল না। তাই আচমকা অল্প অসুখ নারী নিজেই ঘরোয়া পদ্ধতিতে সারিয়ে তুলতে পারবে বা রোগের লক্ষণ বুঝে সেবা করতে পারবে।

এর থেকেও আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। নারীর শিক্ষার সঙ্গে যখনই স্বাস্থ্যকে যুক্ত করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, নারী শিক্ষিত হলে সে আসলে পরিবারেই হয়ে উঠবে দশভুজা। একদিকে সে রোগীর সেবা করবে, স্বামীর সঙ্গে পড়াশোনা, দেশ, সমাজ নিয়ে আলোচনা করবে, অন্যদিকে সন্তান প্রতিপালন ও তাদের উপযুক্ত শিক্ষাও প্রদান করবে। প্রসূতির সেবা যতটা সুস্থ সন্তানের আশা থেকে, ততটাই কি সুস্থ নারীর আশায়? কিম্বা এখানেও ঘুরিয়ে বলা যায়, নারী নীরোগ থাকলে সে সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারবে, সংসারের দায়িত্ব সামলাবে দু হাত দিয়ে। এই আশা থেকেই কি তাঁরা নারীর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেয়নি? মহিলা পত্রিকা, মাঘ, ১৩১০ এ নারীর সংসারের কাজের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। -

- গৃহ এবং গৃহ সামগ্রী পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা।
- পরিমিত ব্যয়ে সুচারুভাবে গৃহস্থালি সম্পন্ন করা।
- রান্না ও খাবার পরিবেশন।
- সূচিকর্ম।
- পরিজনদের যত্ন।
- সন্তান প্রতিপালন।

এই যদি নারীর কাজের তালিকা হয়, তাহলে অবশ্যই নারীর সুস্থ শরীরের প্রয়োজন। তাই জন্যই কি মহিলাদের পত্রিকা দুটিও বিশেষ ভাবে নারীর স্বাস্থ্যের দিকটি তুলে ধরছে! প্রশ্নটি থেকেই যায়।সুতরাং আমাদের মনে সন্দেহ আসতেই পারে তবে কি নারীর স্বাস্থ্যও তার পরিবারের চাহিদার অনুপন্থী?পুরুষ চাইলেই, বা পুরুষকে তার যথার্থ সেবা যত্ন করার উদ্দেশ্যেই নারীর নীরোগ থাকা প্রয়োজন? আলাদা করে তার অস্তিত্বের কি কোনও মূল্য নেই? প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর আমরা পাই না।

তবে এর থেকেও সম্ভাবনার কয়েকটি দিক আমরা পাই। বেশ কিছু জায়গায় নারী সমাজের অন্ধ বিশ্বাস কাটিয়ে বেরোতে পারছে না ঠিকই, তবে তার একটা উত্তরণ হচ্ছে, তা অস্বীকার করার জায়গা থাকে না। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীরা যতই গেল গেল রব তুলুন না কেন, নারীর পাঠক্রম নিয়ে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, নারীর শিক্ষার যে প্রয়োজন আছে, তা এই পত্রিকাগুলি বারবার তুলে ধরছে। হয়ত আত্মপক্ষ সমর্থনে তাই তাদের বারবার ‘পরিবার’ কে কেন্দ্রে রাখতে হয়েছে। যাতে অন্তত পারিবারিক সমৃদ্ধির কথা ভেবে অন্তত পুরুষ নারীশিক্ষায় আগ্রহী হয়। মহিলাদের শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন লেখা এটি প্রমাণ করে সেযুগে মহিলারাও ধীরে ধীরে শিক্ষার কদর করতে পারছেন। সমসাময়িক অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাদের অবস্থানটি চিনতে সক্ষম হচ্ছেন। কেন শিক্ষা, কেমন শিক্ষা তা নিয়ে অন্তত নারীর একটি নিজস্ব স্বর তৈরি হচ্ছে। *বামাবোধিনী, পরিচারিকা, মহিলা, অবলাবান্ধব* –রা যেখানে থামছে, *বঙ্গমহিলা, অন্তঃপুর* সেখান থেকে তাদের যুক্তি শুরু করছে। তাঁরা শিক্ষার উপযোগিতা, মহিলার স্বাস্থ্যের গুরুত্ব নিয়ে এমন বেশ কিছু কথা বলছেন, যা উনিশ শতকের মানুষ এর আগে কখনও ভাবতে পারেননি। নারী শিক্ষার সূচনা থেকে প্রায় ২-৩ দশকের মধ্যে নারীর শিক্ষাকে এইরকম জায়গায় পৌঁছে দেওয়া সেইসময়ের নিরিখে

অবশ্যই সহজ কাজ ছিল না। উনিশ শতকের শেষ তিনটি দশকে আলোচ্য পত্রিকা দুটি সেই নতুনত্বেরই সন্ধান দিতে পেরেছে। শিক্ষার এই ক্রমন্নতি নিয়েই বঙ্গীয় নারী বিশ শতকে পা রাখবে, যেখানে শুরুতেই আমরা পাবো বেগম রোকেয়ার মত নারীচরিত্র, যিনি একে একে নারীকে ঘিরে সমস্ত অন্ধবিশ্বাস একে একে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে। কিম্বা সাহিত্যে পাবো, 'বিনোদিনী'- র মত চরিত্র, যে বাড়িতে মেমের কাছে লেখাপড়া শিখবে এবং নারীপ্রগতির মূল কথাটি তুলে সমাজের কাছে তার দুর্দশার কারণ জানতে চাইবে। কিম্বা পাবো 'ভ্রমর' এর মত স্ত্রীকে, যে বলবে, স্বামী যতদিন ভক্তির যোগ্য ততদিনই তিনি ভক্তি পাবেন, স্বামী মানেই দেবতা এই বিশ্বাসকে তাঁরা প্রতি পদে প্রশ্ন করতে করতে যাবে। উনিশ শতকের শেষে এই কথাগুলি বলার জায়গা অন্তত তৈরি করতে পেরেছিল মহিলারা। আর তাদের এই কাজে অক্লান্তভাবে সাহায্য করে গেছে, তাদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলি। উন্নতির সোপান প্রস্তুত করতে এবং বঙ্গনারীকে বিশ এর আধুনিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে বঙ্গমহিলা এবং অন্তঃপুরের শিক্ষা দেওয়ার এই পদ্ধতি তাই এক কথায় বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, বঙ্গনারীর চরিত্র নির্মাণেও পত্রিকাগুলির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।নারীর অস্তিত্বের মূল রূপটি তাঁরা যথার্থ তুলে ধরতে পেরেছিল।(দ্রষ্টব্যঃ তৃতীয় অধ্যায়)। তাই বেশ কিছু স্থানে গতানুগতিকের বাধা অতিক্রম করতে না পারলেও বঙ্গমহিলা ও অন্তঃপুর আধুনিকতার একটি নতুন আদর্শ নারীর কাছে প্রকাশ করতে পেরেছিল। এতদিনের বিশ্বাসকে আচমকা সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভবপর না হলেও, বিশ্বাস ও যুক্তির যে তর্ক তাঁরা উপস্থাপিত করেছিলেন তার প্রভাব অবশ্যই প্রশংসনীয়।

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতক বাংলা সমাজ-রাজনীতি-শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে এক বর্ণময় সময়। সমাজে কিভাবে নতুন, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত প্রধানত বর্ণহিন্দু 'বাবু' সম্প্রদায় তৈরি হল এবং সেই এক কাঠামো মেনে না হলেও এক বিশেষ শিক্ষিতা 'আধুনিকা' মহিলা তৈরির চেষ্টা হচ্ছিল, তা আমরা আগের দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। উনিশ শতকের বাঙালি পুরুষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শুধুমাত্র উপনিবেশের বাধ্য প্রজা হয়ে থেমে থাকেনি। তাঁরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে সেই শিক্ষাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁদের অনুষ্ঠিত নানা সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলিতে। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে সমাজে একের পর এক সংস্কার আন্দোলনগুলি হচ্ছিল, এবং খেয়াল করলে দেখব এই সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন উনিশ শতকের মহিলারা। উনিশ শতকের শিক্ষিত, সমাজ সচেতন মানুষ বাঙালি নারীর এই হীনাবস্থা মানতে পারেননি। তাই একের পর এক নিষ্ঠুর, ঘৃণ্য প্রথা দূরীকরণে অংশ নিয়েছেন। আমরা উনিশ শতকের এমন কিছু সংস্কার আন্দোলনগুলির দিকে নজর দিতে পারি, যেখানে বিবাদের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বাঙালি নারী।–

- সতীপ্রথাঃ সতীপ্রথা শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিলো। অষ্টাদশ দশকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত এই প্রথা ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গেছিল। যদিও সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার শুরুও অনেক আগের থেকেই। জানা যায়, আকবরের আমলেও এই প্রথা দূরীকরণের চেষ্টা হয়েছিল। তবে তা যে কার্যকর হয়নি সে তো বলাই বাহুল্য। এরপর অষ্টাদশ শতকের শেষে এসে ইংরেজ মিশনারীরা সতীপ্রথার বিরোধিতা শুরু করে। যদিও সেই সময়ে

বিদেশি শাসকগণ আইন করে এই কুপ্রথা বন্ধের চেষ্টা করেননি। তাঁদের ধারণা ছিল এই প্রথার বিরোধিতা করলে ভারতীয়দের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে। এরপর বাঙালি সমাজ পায় রামমোহন রায়(১৭৭২-১৮৩৩) –এর মত ব্যক্তিত্বকে।যিনি সতীপ্রথা নিবারণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু যানা যায় তারও আগের থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সতীপ্রথা সম্পর্কে বিরোধ ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। ডঃ অজয়েন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্করচনা' বইতে বলেন,

> এস ডি কোলেটের মতে ১৭৭২ সালেই সতীপ্রথার বিরুদ্ধে বিদেশীর হস্তক্ষেপ ঘটেছিল। ঐ বছরে দক্ষিণ ভারতের ত্রিপল্লীতে ক্যাপ্টেন টমিন মৃতস্বামীর চিতারোহণে উদ্যত জনৈকা বিধবাকে উদ্ধার করে এক নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।– একেই তিনি বিদেশী হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করেছিলেন। ঐ বিদেশী হস্তক্ষেপে অসন্তুষ্ট হয়ে এক ক্রুদ্ধ জনতা দাঙ্গাহাঙ্গামা করেছিল বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। [১]

এই ঘটনা থেকে আমরা বলতে পারি, সেই সময়ের মানুষ সতীপ্রথাকে কুপ্রথা বলে মানতে রাজি ছিলেন না। তাই এই বিষয়ে অন্য কারোর হস্তক্ষেপও তাঁরা মানতে রাজি ছিলেন না। তাই ভারতবর্ষে আঠারো শতকের শেষ থেকে এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে নানা স্বর উঠলেও তা কোনও সুদূরপ্রসারী ফল দিতে পারেনি। অবশ্য এইসময়কাল জুড়ে যত আন্দোলন ঘটেছে, তা নেহাতই ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সরকার থেকে এই বিষয়ে উদ্যোগ দেখা যায় আরও পরে। ১৭৮৯ সালে জনৈক ব্রিটিশ

১। ড. অজয়েন্দ্রনাথ সরকার , *উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্করচনা,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৮২, পৃষ্ঠাঃ ৪৩-১২৩

ম্যাজিস্ট্রেট লর্ড কর্নওয়ালিসকে একটি চিঠিতে জানান, সতীপ্রথার ভয়াবহতার বিষয়ে। (The life and letters of Raja Rammohun Roy, S.D.Collet, edited by Dilip Kumar Biswas, Prabhat Chandra Ganguly;1962.P-79) । যদিও কর্নওয়ালিস সরাসরি সতীপ্রথা উচ্ছেদ না করলেও রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সতী হতে ইচ্ছুক নারীদের সতী না হওয়ার আবেদন জানাতে এবং খেয়াল রাখতে নারীকে জোর করে মাদক দ্রব্য খাইয়ে সতী হতে বাধ্য করা যাতে না হয়। এরপর ১৮১৩ সালে লর্ড মিনটো তাঁর 'মিনিট'-এ বলেছিলেন, সতীপ্রথা অনুষ্ঠিত করার আগে সরকারের কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে, সরকার দেখবে, নারীকে জোর করা হচ্ছে কিনা, বা তার বয়স অন্তত ১৬ কিনা, কিম্বা সে অন্তঃসত্ত্বা কিনা, এই বিষয়গুলি দেখে তবেই সরকার সতী হওয়ার আবেদন মঞ্জুর বা নাকচ করবে। অবশ্য এতকিছু করেও সতীপ্রথার ব্যপ্তি আটকানো যায়নি। বরং সাধারণ মানুষ সরকারের এই প্রচেষ্টার উলটো অর্থ ধরেছিল। তাদের ধারণা ছিল, একটি বা দুটি ঘটনা ছাড়া সরকারও সতীদাহ করার ক্ষেত্রেই রায় দেবে। তাই তাদের কাছেও এই প্রথাটির গৌরব বেড়েছিল বৈ কমেনি। মিশনারীরা এই প্রথা রদের জন্য নানাবিধ চেষ্টা চালিয়েছে। জানা যায় উইলিয়াম কেরী সতীপ্রথা সম্পর্কে দেশীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে প্রচুর শাস্ত্র ও শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেগুলির সঙ্গে সতীপ্রথার বর্তমান অবস্থা বিশদে জানিয়ে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলির কাছে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছিলেন। (the life and times of carey,marshman and ward vol 2-j.c.marshman; 1859;p222)। এরপর রামমোহন রায় 'আত্মীয় সভা'(১৮১৫)-তে সতীদাহ বিষয়ে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা করতেন। ১৮১৭-১৮২৫ পর্যন্ত সতী বিরোধী আন্দোলন

একপ্রকার চলছিল, কিন্তু ১৮২৫ –এর পর থেকে এই আন্দোলন গতি লাভ করে। তার কারণ স্বরূপ একটি ঘটনা লেডি আমহার্স্ট এর ডায়েরি থেকে জানা যায়, কলেরায় মৃত এক যুবকের স্ত্রী সহমরণে যেতে প্রস্তুত হয়ে আচরণীয় সব কাজ করা সত্ত্বেও চিতায় আগুন ধরানো মাত্র সে ভীত হয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়, পরে তার কি হল তা নিয়েও নানা মতভেদ আছে। এই ঘটনা রামমোহন সহ প্রগতিশীলদের আঘাত করেছিল এবং তাঁরা এই প্রথা নির্মূলের জন্য অনেক বেশি তৎপর হয়ে ওঠেন। সেই সময়ে লর্ড আমহার্স্ট এই প্রথা নিয়ন্ত্রণে কিছু বিধিনিষেধ দেন, যেমন সতী হওয়া বিধবার মৃত স্বামীর যা কিছু সম্পত্তি তা সরকার বাজেয়াপ্ত করবে। বস্তুত এর কারণ সম্পর্কে বলা যায়, সেকালে বিধবার আত্মীয়রা অনেকসময়েই সম্পত্তির জন্য তাঁকে জোর করে সতী করত। কিন্তু এই বিধির পরেও সতীসমস্যা রয়েই গেল। ফলে প্রগতিশীলরা চেয়েছিলেন আইন করে এই প্রথা বন্ধ করতে। লর্ড আমহার্স্ট-এর আমলে বিলেতের মানুষেরাও পার্লামেন্টে এই আইন পাশ করার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ধর্মে আঘাত হানলে তা শাসনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে এই ধারণা থেকে তখনও ব্রিটিশ সরকার মুক্ত হতে পারেনি। এরপর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রামমোহনের পরিচালিত সতী বিরোধী আন্দোলনের সাহায্যে ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীপ্রথা নিষেধক আইন পাশ করেন। সেকালের শিক্ষিত সব ব্যক্তিরাই সতীপ্রথার অবলুপ্তি চেয়েছিলেন, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। এই আইন পাশের পর বাঙালি রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ‘ধর্মসভা’ (১৮৩০) প্রতিষ্ঠা করে ১৮৩০ এর ১৪ই জানুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সতী বিরোধী আইনটি রদ করার আবেদন জানান, এই আবেদনপত্রে সই করেন, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, কালাকান্ত

বিদ্যাবাগীশ, রামজয় তর্কালঙ্কার প্রমুখ নানা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। যদিও এই আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

• বিধবাবিবাহঃ ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন প্রচলিত হয়। এই আন্দোলনের বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের(১৮২০-১৮৯১) নাম সাধারণভাবে নেওয়া হলেও, শুধুমাত্র তাঁরই কৃতিত্বের কথা বললে, এই আন্দোলনের যথার্থতা প্রকাশিত হয় না। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে প্রথম যাঁরা সংগঠিত স্বর তোলেন, তাঁরা ইয়ং বেঙ্গল। বিদ্যাসাগরের সমকালেও এঁরা তাঁকে নানাভাবে সহায়তা করেন। তাঁদের পরিচালিত পত্রিকা, 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' এ বিধবাবিবাহের সমর্থনে প্রচুর লেখালেখির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৩৩ সালে বিধবার আবার বিয়ের বিষয়ে একটি সভা করার কথা জানা যায়। যার উদ্যোক্তারা ছিলেন, 'কতিপয় ধনি লোক'। যদিও এটি কার্যকর হয়নি। ১৮৩৭ সালে 'ইন্ডিয়ান ল কমিশন' গঠিত হয়, এই কমিশনের সদস্যরা বিধবাবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝলেও আইন করার কথা ভাবেননি। পরবর্তীকালে রাধাকান্ত দেবরা এই কমিশনের মনোভাবকেই বিধবাবিবাহের বিপক্ষ আন্দোলনের হাতিয়ার করেছিলেন।

•কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথাঃ উনিশ শতকে এই দুটি কুপ্রথা প্রচলিত থাকলেও ১৮৫০সালের আগে এই প্রথার বিরুদ্ধে কোনও সংগঠিত আন্দোলনের কথা জানা যায় না। ১৮৫০ এর আগে নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে এই প্রথার খারাপ দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা হয়। 'আত্মীয় সভা'তে বহুবিবাহের খারাপ দিকগুলি বিষয়ে আলোচনা হত। কিন্তু এই সভার সদস্যরা এই আন্দোলনকে জোরদার করার বিষয়ে সক্রিয় ছিলেন না বলেই ধরে নেওয়া যায়। রামমোহন রায়ের সময়ে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী তাঁদের পত্রিকায়

কৌলীন্য ও বহুবিবাহ নিয়ে অনেকবার সোচ্চার হয়েছেন। ১৮৩০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর 'সমাচার দর্পণ' এ লেখা হয়-

> হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞাক্রমেতে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে পারে।[১]

অর্থাৎ আমরা এর থেকে ধরে নিতে পারি দেশের বেশ কিছু মানুষ অন্তত সেই সময়ে এই দুই প্রথা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিলেন এবং শুধুমাত্র জনমানসে সচেতনতা বৃদ্ধি করেই হবে না, এই ধরনের কুপ্রথা সমাজ থেকে বিতারিত করতে হলে যে সরকারের সাহায্যে রীতিমত আইন বানিয়েই তা রদ করতে হবে, এই সম্পর্কেও ভাবনা-চিন্তা চলছিল। আর সমাচার দর্পণ যেহেতু মিশনারীরা প্রকাশ করতেন, তাই বলতেই পারি, এই বিষয়েও তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন। সরকারের কাছে সমাজের উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজসচেতন ব্যক্তিরা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম আবেদনপত্র পাঠান, ১৮৫৪ সালে। বহুবিবাহ রদের ক্ষেত্রে যার অবদান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তিনি হলেন, কিশো্রীচাঁদ মিত্র। ১৮৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তাঁরই প্রচেষ্টায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে স্থাপিত হয়, 'সমাজোন্নতি বিধায়ক সুহৃদসমিতি'। এই সভার পক্ষ থেকেই প্রথম বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। এছাড়াও ১৮৫৪ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে এই বিষয়ে অনেক আবেদনপত্রই জমা পড়েছিল। পরবর্তীতে সেইসময়ের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য দেবনারায়ণ সিংহ বহুবিবাহ বিরোধী একটি খসড়া বিলও প্রস্তুত করেন এবং আবেদন করেন

১। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,২য়, ৩য় সং,*- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; পৃষ্ঠাঃ ২৪৩

১৮৬৩ সালে। ১৮৬৬ সালের ১লা জানুয়ারি রাধাকান্ত দেব বহুবিবাহ আইনের বিরোধিতা করে এক আবেদনপত্র পাঠান। ঐ বছরই ১লা ফেব্রুয়ারি, বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে মহারাজা শতীশচন্দ্র ও অন্যান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ডেপুটেশনের মাধ্যমে দেওয়া হয় গভর্নর সিসিল বীডন-এর হাতে। বীডন সাহেব উপস্থিত মানুষদের আশ্বাস দিয়ে বলেন,

> I shall gladly use my best endeavours to procure the enactment of a law to restrain the abuses attending the practice of polygamy among Hindus, and to impose upon a custom, which I cannot but regard as altogether demoralizing, the utmost degree of restriction of consistent with the reasonable opinions and wishes of the intelligent Hindu public![১]

অর্থাৎ সরকার থেকেও এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে গেছিল, এবং তাঁরা যে এক্ষেত্রে প্রগতিশীল হিন্দুদের পাশে ছিলেন, এই কথাও আমরা বলতেই পারি। কিন্তু এতদসত্বেও এই আন্দোলন পুরোপুরি সাফল্য পায়নি। ১৮৫৮ তে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে তিনি এই বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারকে হস্তক্ষেপ না করার কথা বলেছিলেন কারণ বিধবাবিবাহ আইন পাশ হওয়ার পরে রটেছিল, এই আইনই সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। এছাড়াও নানান সভা সমিতি এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে প্রচুর জনমত গড়ে তুলতে থাকে। সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী এই প্রথার বিলুপ্তিতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ত। ফলে ধীরে ধীরে এই আন্দোলন গুটিয়ে যায়। কিন্তু তা সত্বেও শিক্ষিত, উদারচিন্তার প্রগতিশীল মানুষেরা এই আন্দোলনের দ্বারা এর কুফলটি

১। Isvar Chandra Vidyasagar 1907- S.C. Mitra; P-229

অন্তত সমাজের কাছে তুলে ধরতে পেরেছিলেন, সেইটি ছিল এই আন্দোলনের সার্থকতা, যা পরবর্তীকালে এর বিরুদ্ধে আইন পাশকেই ত্বরান্বিত করে।

• বাল্যবিবাহ প্রথা রদঃ বাল্যবিবাহ রদের ক্ষেত্রেও প্রথম এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করে 'আত্মীয় সভা'। রামমোহন রায় ও ব্যক্তিজীবনে বাল্য বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। পনেরো-ষোলো বছরের আগে তিনি তাঁর নাতনীর বিয়েও দেননি বলেই জানা যায়। তবে বিভিন্ন সময়ে এই সভায় আলাপ-আলোচনা হলেও রামমোহন রায় বাল্যবিবাহ নিয়ে কোনও সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেননি এমনকি তাঁর লেখাপত্রেও এই বিষয়ে তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। উনিশ শতকের অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও বাল্যবিবাহ নিয়ে আন্দোলন করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। এই বিষয়ে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কথা গুরুত্বপূর্ণ,

> বাল্যবিবাহ ইষ্টানিষ্ট কিছুই জানিতাম না; তদ্বিষয়ের কোন আন্দোলনও শুনিতে পাইতাম না এবং সকলকেই বালক-বালিকার পরিণয়ের জন্য ব্যস্ত দেখিতাম।[১]

এই বক্তব্যটি প্রমাণ করে সেযুগে বাল্যবিবাহ নিয়ে তেমন কোন সোচ্চার দাবী ওঠেনি। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর জনমত গঠনের চেষ্টা করেছিলেন, জানা যায়, তিনি 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন ১৮৫০ সালে। এছাড়া তিনি সমাজসংস্কার বিষয়ক একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন, যাতে ২ ও ৫ নং শর্তে বলা হয়েছিল,

> ২) একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না। এবং ৫) অষ্টাদশ বর্ষ পূরণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না।[২]

১। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত-কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, আই এ পি সং; ১৩৬৩; পৃষ্ঠাঃ ৩২

২। বিদ্যাসাগর ১৮৯৫, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃষ্ঠাঃ ৩৩৫

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'–য় ১৮৫৬ সালে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বলা হয়েছিল। ব্রাহ্মরা বাল্যবিবাহ নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ সালে 'ভারত সংস্কার সভা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিবাহের বয়স নির্ধারণ করার কথা বলেছিলেন। যদিও আদি ব্রাহ্ম সমাজ এর বিরোধিতা করে।এমনকি 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাও এর বিরোধিতা করেছিল। বাল্যবিবাহের পক্ষেও প্রচুর সমর্থন ছিল। অক্ষয়কুমার সরকার *'নবজীবন'* পত্রিকায় (৪র্থ ভাগ, কার্ত্তিক, ১২৯৪; ৪র্থ সংখ্যা) 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে বাল্যবিবাহকে সমর্থন করেছিলেন। আবার এই আন্দোলনে 'সমাজদীপিকা'-র মত পত্রিকার কথাও উল্লেখ করা যায়, যারা বাল্যবিবাহের পক্ষেও ছিল না আবার বেশি বয়সে বিয়ে দেওয়ারও পক্ষপাতী ছিল না। এঁরা বলতেন,

> আমাদের মতে, দশ বৎসর হইতে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত বিবাহের মুখ্যকাল।..... স্ত্রীগণের দশ ও পুরুষের ষোড়শ বর্ষাবধি বিবাহই যুক্তিযুক্ত।[১]

সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে আসতেই পারি সেকালের শিক্ষিত মানুষ বাল্যবিবাহ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করলেও এটি তাঁদের কাছে বাকি ঘটনার মত গুরুত্ব পায়নি। কিম্বা বেশ কিছু প্রশ্ন উঠলেও ১২-১৪ বছরের বেশি বয়সে কন্যার বিয়ে দেওয়ার কথা সেকালের উদার মানুষের চিন্তাভাবনাতেও আসেনি। সুতরাং এটি যে কেন সেকালে বড় আন্দোলনে পরিণত হয়নি, তা আমরা এইসকল মানুষের মানসিকতা থেকেই বুঝে নিতে পারি।

- পণপ্রথা ও কন্যাবিক্রয়প্রথা বিলোপ আন্দোলনঃ উনিশ শতকে এই দুই প্রথার ভয়াবহতাও ছিল চোখে পড়ার মত ঘটনা। এই দুটি প্রথার বিরুদ্ধে বেশ কিছু

১। সমাজদীপিকা, ১ম খণ্ড, ৭ম সঙ্খ্যা, ১২৯২

আন্দোলন হলেও তা বিশেষ জোরালো ছিল না। ১৮৫৫ সালে 'সমাজোন্নতি বিধায়ক সুহৃদসমিতি' বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিল তাতে কন্যাপণ নিবারণের কথাও বলেছিল। জানা যায় বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও কন্যাপণের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা বলে,

> কন্যা জন্মিলেই সর্বনাশ! বরের অথবা বরের পিতামাতার অসঙ্গত অর্থ লোভই এই বিপত্তির কারণ।[১]

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা দেখেছিল বাংলার সুবর্ণ বণিকদের মধ্যেই কন্যাপণের ব্যপ্তি সর্বাধিক ছিল। তাই তাঁরা এই সম্প্রদায়কেই এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিল। এছাড়া *'হিতসাধক'* পত্রিকায় (১ম খণ্ড , ১২৭৪; ফাল্গুন। ২য় সংখ্যা) *'আসুরবিবাহ-কন্যাবিক্রয়'* নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যেখানে কন্যাবিক্রয় প্রথার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। তবে এইসকল লেখালেখি ছাড়া কন্যাপণ- কন্যাবিক্রয় নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা যায়নি। বর্তমান একুশ শতকে দাঁড়িয়েও তো আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না যে এখন আমাদের সমাজে কন্যাপণ প্রথা নেই। খবরের কাগজ খুললেই প্রায়দিনই চোখে পড়ে পণের জন্য গৃহবধূর উপর অত্যাচার, খুনের ঘটনা। সুতরাং সেই সময়ে যে এই আন্দোলন পূর্ণতা পাবে না, তা খানিকটা স্বাভাবিক বলা জায়। কিন্তু তবু যে অন্তত সে যুগেও কিছু মানুষ এই প্রথার বিরুদ্ধে স্বর তুলেছেন, জনমত গঠনের চেষ্টা করেছেন, তা সেইকালের অগ্রসরতার পরিচয়ই বহন করে।

- নারীশিক্ষাঃ এই অংশটি আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ৪র্থ, ১ম সংখ্যা-বিনয় ঘোষ সম্পাদিত,১৯৬৬, পৃঃ ২০৬-২০৭

উনিশ শতকের নারীকেন্দ্রিক সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এটি ছিল একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এখন প্রশ্ন, উনিশ শতকে, শিক্ষিত মাত্রেই সকলেই কি বাড়ির মহিলাদের শিক্ষা, স্বাধীনতা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন! এই প্রশ্নের উত্তর যে না, তা এক কথায় বলে দেওয়াই যায়। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতায় আলোকিত উদারপন্থী একদল যখন নারী সমাজের উন্নতির কথা ভাবছেন, তাঁদের শিক্ষিত করার জন্য লড়াই করছেন, তখন তাঁদের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে আছেন আর একদল মানুষ- এঁরাও নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি, উনিশ শতকে তৈরি হওয়া নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেনী, যারা উপনবেশের প্রজা হিসেবে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, কিন্তু তা সত্বেও ধর্মীয় গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা তাঁরা ত্যাগ করতে অসমর্থ। এই দলের মানুষেরা একের পর এক যুক্তি দিয়ে স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধাচারণ করে গেছেন। এমনকি সতীপ্রথা, বিধবাবিবাহ আইন নিয়েও প্রকাশ করেছেন ঘোর অসন্তোষ। সেকালে দাঁড়িয়ে কি ছিল এঁদের যুক্তি, তা আমরা স্বল্প পরিসরে দেখার চেষ্টা করব।–

উনিশ শতকের শুরুতে যখন রামমোহন রায় সতীপ্রথার বিরোধিতা করতে লেখেন, ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’(১৮১৮), যেখানে তিনি একে একে শাস্ত্রের উল্লেখ করে দেখান, সতীপ্রথা আসলে একপ্রকার স্ত্রীহত্যা, শাস্ত্রে কোথাও এই বর্বর প্রথার সমর্থন নেই। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রামমোহন রায়ের এমন যুক্তিপূর্ণ তার্কিক মত খণ্ডন করার অভিলাষী মানুষের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। রামমোহনের এই পুস্তিকার পরেই রক্ষণশীল সমাজের এক সদস্য, কাশীনাথ তর্কবাগীশ লেখেন *‘বিধায়ক- নিষেধকের সম্বাদ’* (১৮১৯ এর ১৮ই সেপ্টেম্বর, ‘সমাচার দর্পণে’)। এই বিতর্ক গ্রন্থে তিনি আসলে সতীপ্রথার পক্ষেই সওয়াল করেছেন এবং রামমোহনের বিরোধিতা করেছেন। রামমোহন তাঁর

পুস্তিকায় বিধবা নারীকে জোর করে বেঁধে চিতায় জ্বলন্ত পোড়ানোর নিন্দে করেছেন, কিন্তু কাশীনাথ তাঁর প্রবন্ধয় এই কাজের ও যুক্তি দিয়ে হারীতের বচন থেকে বলেন,

> স্ত্রীশরীর পরিপূর্ণভাবে দগ্ধ না হলে শরীর থেকে নারীর মুক্তি ঘটে না। এই জন্যই ঐ বন্ধনাদির প্রয়োজন।[১]

এই কথাটি প্রমাণ করে সতীপ্রথার সমর্থকদের যুক্তি কতটা দুর্বল ছিল। যে সমাজে একজন মানুষকে জ্বলন্ত পোড়ানোর পক্ষে এমন যুক্তি দেওয়া যায়, সেই সমাজের আধুনিকতা নিয়েই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। এরপরে ১৮৭৭ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'সতীদাহ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি সতীপ্রথার সমর্থনে কথা বলেন। সতীপ্রথার সমর্থনে যুক্তি দিতে গিয়ে বলছেন,

> সামান্য সংখ্যক নারীর মৃত্যুতে সংসারে কোন অসুবিধা ঘটে না।[২]

এছাড়াও সতীপ্রথার পক্ষে বলছেন,

> বৈধব্যের যন্ত্রণা অসীম। পিতামাতা তার ব্রহ্মচর্য পালনে বেদনাবোধ করে থাকে। তাছাড়া কন্যার পদস্খলন ঘটবার ভয়েও তারা ভীত থাকে। এহেন অবস্থায় তার মরাই ভালো।[৩]

একজন মহিলাকে পুড়িয়ে মারার জন্য যুক্তিটি যে ভয়ানক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যঙ্গ করে বলতেই পারি সতীপ্রথার সমর্থকরা নিঃসন্দেহে নারীর দুঃখের সমব্যথী ছিলেন, তাই জন্যই এমন রায় তাঁরা দিতে পেরেছেন।

১। অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯

২। *বঙ্গদর্শন*, আষাঢ় ১২৮৪, ঐ

৩। অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, তদেব, ১২৫

এ তো গেল সতীপ্রথার সমর্থনের প্রসঙ্গ। বিধবাবিবাহের বিপক্ষেও কথা বলার লোকের অভাব সেকালে ছিল না। নন্দকুমার কবিরত্ন 'বৈধব্য ধর্মদয়' নামে একটি পুস্তক লেখেন, যার প্রকাশকাল জানা যায় না।তিনি বলেন,

> বিধবাগর্ভজাত পুত্র ঔরসপুত্রের মর্যাদা পাবার যোগ্য নয়; কেননা বিধবাকন্যা কখনও ধর্মপত্নী হতে পারে না।[১]

রামধন দেবশর্মা, 'বিধবাবেদন নিষেধক' প্রবন্ধে(প্রকাশকাল অজ্ঞাত) বিধবাবিবাহের বিপক্ষে কথা বলেন। অজয়েন্দ্রনাথ সরকার এই প্রসঙ্গে বলেন,

> রামধন ক্ষত বা অক্ষতযোনি কোনরকম বিধবারমণীর বিবাহকেই শাস্ত্রসম্মত মনে করেননি।[২]

প্রতিবাদী কালিদাস মৈত্র বলেছিলেন, পরাশর বৈধব্যকে অপরাধীর অপরাধের শাস্তি (দণ্ড) হিসেবে দেখেছেন এবং ঋতুমতী নারীকে বিবাহ করবার মধ্যে দোষ রয়েছে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। *'বঙ্গদর্শনে'* ১২৮৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, 'দ্বিতীয়বার বিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিকের নাম না থাকলেও তিনি যে অতি রক্ষণশীল মনের মানুষ ছিলেন, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তিনি ম্যালথসের মতে জনসংখ্যা কমানোর পক্ষপাতী বলে নিজেকে দাবী করেন, এবং তাঁর মতে বিধবার বিবাহ দেওয়া তাই অনুচিত। বক্তব্যটি অভিনব সেই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকে না ঠিকই। তবু মনে প্রশ্ন আসে, শুধু বিধবার বিয়ে দিলেই কি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা? বিপত্নীকের পুনরায় বিয়ে বা পুরুষের বহুবিবাহে কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় না? যদিও সেযুগে বিরোধীরা যে এমন কুযুক্তির ওপর আশ্রয় করেই নিজেদের মত প্রকাশ করে গেছেন এবং নারীমুক্তির বিরোধিতা করেছেন

১। ঐ, ১৪৪

২। ঐ, ১৪৯

সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের এমন চিন্তাভাবনার গুরুত্ব মোটেই কম ছিল না, আর সেই কারণেই বহুবিবাহ বা বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন তৈরি করা সম্ভব হয়নি। বলা ভালো সেযুগে বিরোধীদের সংখ্যা বরং অনেক বেশি ছিল। অবশ্য একুশ শতকে দাঁড়িয়েও তো আমরা এখনো ক্রমাগত নারী স্বাধীনতার বিপক্ষকারীদের মুখোমুখি হয়েই থাকি। এখনো মন্দিরে ঢোকার অনুমতির জন্যও আমাদের আইনের দ্বারস্থ হতে হয়, সুতরাং সবে আধুনিকতায় পা রাখা একটি সমাজের মানুষ যে হঠাৎ করে নিজেদের মানসিকতা বদলাতে পারবেন না, তা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না, বরং যা আশা জাগায়, যে সম সময়ে দাঁড়িয়েও একদল মানুষ যুগের থেকে এগিয়ে ক্রমাগত নারীস্বাধীনতা, নারীশিক্ষার শ্লোগান তুলে নিজেদের অগ্রসর মানসিকতারই প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে যে সমাজ- সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে কথা বললাম, তার উদ্দেশ্য একটিই,- সেকালের অর্থাৎ উনিশ শতকের মহিলার তৎকালীন বাস্তব অবস্থাটি তুলে ধরা। উনিশ শতকের নারী কোন অবস্থান থেকে আধুনিকতার যাত্রা শুরু করছে সেটি সম্যকভাবে অনুধাবন না করলে আমরা উনিশ শতকের নারী স্বাধীনতার ইতিহাসটির বিশ্লেষণ করতেও অসমর্থ হব। এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম, উনিশ শতকের বেশ কয়েকটি সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠার দিকটি। এইসব সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন উনিশ শতকের নারী। কিন্তু এই নারীরা কারা? উনিশ শতকে আধুনিকতার ছোঁয়া পাওয়া বাঙালির সংখ্যা বাংলাদেশের সামগ্রিক বাঙালি অধিবাসীর তুলনায় ছিল নগণ্য। বঙ্কিমের ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধের সাপেক্ষে আমরা বলতেই পারি, শিক্ষিত বাঙালির অনুপাত ছিল, প্রতি ৯৯৯ জনে মাত্র একজন। সেক্ষেত্রে বাঙালি সমাজে যত প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলন হয়েছে, তা অনুষ্ঠিত হয়েছে, শিক্ষিত উদারপন্থী বাঙালি পুরুষের

উদ্যোগেই। সর্বসাধারণের মধ্যে এইসকল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়া সম্ভবপর ছিল না। ঠিক যেমন তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের যে সকল বিদ্রোহ , কৃষক বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রমুখ কখনোই নিম্নশ্রেণীর বাঙালির চৌকাঠ ছাড়িয়ে উচ্চবর্ণের আন্দোলন হয়ে ওঠেনি। ঠিক সেভাবেই আমরা দেখি, বাঙালি সমাজে মহিলাদের এই যে হীনাবস্থা যা দেখে, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী বলেন, 'পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি', (নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, অবরোধে হীনাবস্থা,বামাপ, বৈশাখ ১২৭২, পৃষ্ঠাঃ ৩০), তা বেশিরভাগটাই ছিল উচ্চবর্ণের এবং শ্রেণীর মহিলাদের জন্য। নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের সামাজিক গুরুত্ব যেমনই থাক না কেন, তাঁরা অন্তঃপুরস্থিত ছিলেন না। এর উদাহরণ আমরা সেযুগের বহু সাহিত্যেই পাই। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাসগুলিতে বড়লোক বাড়িতে কাজকরা দাসী, পরিচারিকার কথা পাওয়া যায়, তাঁরা কেউই অন্তঃপুরে বন্দী নন। সেকালের 'ক্ষীরোদা'(কৃষ্ণকান্তের উইল), বা 'হীরা'(বিষবৃক্ষ) –রা অন্দরের চার দেওয়ালে আটক ছিল না। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, 'বাহিরে' অবাধ যাতায়াত থাকলেও তারা আসলে কতখানি স্বাধীন ছিল বা উন্নতির স্পর্শ পেয়েছিল, কিন্তু যে সমাজে তখনও নিম্নশ্রেণীর, নিম্নবর্ণের শিক্ষা-সভ্যতার অধিকার জন্মায়নি, সে সময়ে এই শ্রেণীর মহিলারাও যে সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হলেও তার অধিকারী হবে না, সে কথা বুঝে নিতে দেরি হয় না। তাই আমরা শিক্ষিতা, আধুনিকা নারী বলতে যে শ্রেণীর কথা বলব, সেখানে স্থান শুধুই উচ্চবর্ণের নারীদের। সমাজের সব শ্রেণীর, সব বর্ণের নারীদের প্রসঙ্গ সেখানে আসবে না।

আমরা আগেই দেখেছি, অবরোধ প্রথা উনিশ শতকেও বেশ ভালো মাত্রায় চালু ছিল। প্রথম বাঙালি হিসেবে আত্মজীবনী লেখেন যে রাসসুন্দরী তাঁর বর্ণনা থেকেও আমরা

জানতে পারি, মাত্র বারো বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার পরে তাঁকে সর্বদা বাড়ির গুরুজনদের সামনে এক গলা ঘোমটা দিয়েই থাকতে হত। এর প্রায় তিন দশক পরে, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর স্মৃতিকথা '*পুরাতনী*' তে লেখেন তাঁকে তাঁর শাশুড়ি খাইয়ে দেওয়ার কথা,

> তারপর আমাকে কিছুদিন নিজে খাইয়ে দিতে লাগলেন। আমার একমাথা ঘোমটার ভিতর তাঁর সেই সুন্দর চাঁপাকলির মত হাত ভরে দিয়ে ভাত খাওয়াতেন। আমার কেবল মনে হত মা কতক্ষণে উঠে যাবেন আর রেলিঙের ধারে গিয়ে বমি করব। [১]

সুতরাং এই সময়েও অন্দরে বাড়ির বউয়ের ঘোমটা দেওয়া, বা গুরুজনদের সামনে কথা না বলারই রেওয়াজ চালু ছিল। সুতরাং উনিশ শতকের ৬০এর দশকেও অবরোধ প্রথা উঠে যায়নি। অবরোধ প্রথা যে এরপরেও চালু ছিল, তা আমরা জানতে পারি, নীরোদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে ১৮৮৭ সালের শেষ দিকে বিয়ের পর তাঁর মাকে কি নিয়ম মেনে চলতে হত, তার বর্ণনা করেছেন।

> বিয়ের পর পুরো পাঁচ বছর আমার মা তাঁর শাশুড়ির সঙ্গে একটি কথাও বলেননি অথবা তাঁর সামনে ঘোমটাও খোলেননি। ঘরের কর্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সমস্ত 'আলাপ' সারতে হতো মাথা নেরে-উপরে নিচে নেড়ে সম্মতি এবং আড়াআড়ি নেড়ে অসম্মতি জানাতে হতো। যতদিন না ঘরের অন্য কোন মহিলা দেখতে পেয়ে করতাকে না জানাতেন, ততদিন তাঁর কিছু আবশ্যক হলে, তা ছাড়াই সন্তুষ্ট থাকতে হতো।[২]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, নীরোদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন ব্রাহ্ম পরিবারের সদস্য। উনিশ শতকে ব্রাহ্মরাই সমাজে, আধুনিকতায় বাকিদের তুলনায় অনেকাংশে প্রগতিশীল ছিলেন,

---

১। *পুরাতনী*, তদেব

২। N.C.Chaudhury, An Autobiography of an Unknown Indian, 6th Jaico Impression:Bombay: JaicoPublishingHouse,1976,P.140

তাঁদের বাড়ির অন্দরেই যদি মেয়েদের এত কড়াকড়ি, এত অবরোধ মানতে হতো, তাহলে সেকালে অন্যান্য বাড়িতে বিশেষত রক্ষণশীল পরিবারের মহিলাদের অবস্থানটি কেমন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

উনিশ শতকে মহিলাদের পত্র-পত্রিকা নারী স্বাধীনতা, নারীর আধুনিক রূপ নির্মাণ সম্বন্ধে যে অবস্থান নিচ্ছে, তা বোঝার জন্য আমাদের উনিশ শতকের নারীর সামাজিক অবস্থানটি বোঝার জন্য নারীকে নিয়ে আন্দোলনের পটভূমিটি জানার প্রয়োজন ছিল। বস্তুত উনিশ শতকেও নারীকে নিয়ে যতই মুক্ত চিন্তা হয়েছে বা নারী শিক্ষার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, সকলেই একটি বিষয়ে একমত ছিলেন যে, নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র পরিবার। এই পরিবার কাঠামোকে ধরে রাখা এবং তাকে আরও মজবুত করার উদ্দেশ্যেই নারীকে মুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমরা দেখব, আমাদের আলোচ্য পত্রিকা দুটি এই বিষয়ে কি মত পোষণ করে। -

বঙ্গমহিলার প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যায় (১২৮২) একটি কবিতার কথা উল্লেখযোগ্য, 'জানকী'। কবিতাটির রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। সমগ্র কবিতাটি জুড়ে নারীর আদর্শ সীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতাটি শুরু হচ্ছে, " তোমার ভারতী সতি" বলে। বলা হচ্ছে,

হেন পতিভাগ্য যার হ'য়ে যুবরাজ-দার
নাথ সনে সিংহাসনে বড় সাধ আছিল; [১]

আরও বলছেন,

পতি ধ্যান পতি জ্ঞান, পতি বিনা নাহি আন, [২]

১। *বঙ্গমহিলা*, তদেব

২। ঐ

পুরো কবিতাটি জুড়ে রচয়িতা সীতার যে গুণগুলি বর্ণনা করছেন, তা স্ত্রী, মা এবং কন্যার। সতী নারীর আদর্শ কেমন হওয়া উচিত,তা যেন উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

নারী-কুল-রত্ন তুমি উজ্জ্বল ভারত-ভূমি
তবগুণে কর সতি, বঙ্গাঙ্গনা ভূষিত;
আশীষ ভগিনীগণে লভিতে সে চরিত।[৩]

উনিশ শতকের একটি পত্রিকা নারীর আদর্শ হিসেবে সীতার সতীত্ব, তাঁর ত্যাগ, স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি, এই গুণ গুলিকে গৌরবময় করে মহিলাদের সামনে আনছে। তাঁর কোমল হৃদয়, পরপুরুষের প্রতি বিরাগ, স্বামীর সঙ্গে বনবাস গমনকে আদর্শ নারীর কর্তব্য হিসেবে তুলে ধরে উনিশ শতকের বাঙালি নারীর চরিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। খেয়াল রাখব এখানে যে সীতার ছবি আমরা পাই, সে যা করে তা তাঁর স্বামী, পুত্র, সংসারের মঙ্গলের জন্য। আত্মসম্মানী সীতার নিজের মান বজায় রাখতে সংসার ত্যাগ করে পাতালে গমন প্রসঙ্গটি এখানে সাবধানে এড়িয়ে যাওয়া হয়। উনিশ শতকের নারীর কাছে সংসার ত্যাগকে কখনোই গৌরবময় করে দেখানো হচ্ছে না। তাকে সতী নারী হয়ে উঠবার জন্যই প্রভাবিত করা হচ্ছে। এই মত সমর্থনের আর একটি রচনা পাওয়া যায় ঐ একই পত্রিকার একই সংখ্যায়, যার শিরোনাম, ‘ পতি সতীর একমাত্র গতি’। যদিও আমরা পত্রিকার সংকলনে এই রচনাটি পাই না, তবু শিরোনাম থেকে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে স্ত্রীজাতির একমাত্র গুণ যে সতীত্ব এবং তার একমাত্র গতি যে তার পতি, এই ধারণাকে পত্রিকা প্রকাশ্যে গ্রহণ করছে এবং পাঠিকাদেরও সেরূপ করে গড়ে তোলবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। একই সংখ্যায় অপর একটি কবিতা ‘সাবিত্রী’-তেও পাই, নারীর স্বামীর প্রতি ভক্তির উদাহরণ। মৃত স্বামীর প্রাণ

৩। বঙ্গমহিলা, তদেব

ফিরে পেতে যে নারী অনায়াসে যমের দুয়ারে দাঁড়াতে পারে এবং জগৎ- সংসারের সকল বাধা পেরোতে পারে, রচয়িতার কাছে সেই নারী মহৎ।

আশ্চর্য হইনু আমি নৃপাল- কুমারি
সাবিত্রী হেরিয়া তব বল্লভ- ভকতি
এই তব প্রাণনাথ হইল জীবিত, [১]

উনিশ শতকের নারীকে শিক্ষিত করার যে দায়ভার পত্রিকা নিয়েছিল, তাতে নারী শিক্ষা পেয়ে পুরাণ, শাস্ত্র পড়ে যে সীতা, সাবিত্রীর মত সতী, পতি গত প্রাণ হয়ে উঠবে এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল মুখ্য। সংসার এবং স্বামীর প্রতি সেবা যত্ন ছাড়া যে নারীর জীবন বৃথা, তা বুঝিয়ে দিতে পত্রিকাও পিছপা হচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গের আরও বিস্তারিত বর্ণনা পাই, বঙ্গমহিলার ২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যায় (১২৮৩), যেখানে লেখা হচ্ছে, 'পদ্মিনী- চরিত' নামে একটি প্রবন্ধ। যেখানে স্পষ্টত বলা হচ্ছে,

> যে সকল সদগুণের নিমিত্ত সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, দ্রউপদী, গান্ধারী ও খুল্লনা প্রভৃতি রমণীদিগকে পৌরাণিক মহোদয়েরা সতী বলিয়া তাঁহাদিগের নাম নিত্যস্মরণীয় ও তাঁহাদিগকে আমাদিগের পূজনীয়া বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন যে সকল সৎকীর্তি এবং সদগুণের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নাম জন- মাত্রেরই হৃদয়ে জাগরূক আছে, পদ্মিনীও সেই সকল গুণের যথার্থ অধিকারিণী।[১]

এই রচনায় সতী নারীর তালিকাটিকে আরও দীর্ঘ করা হচ্ছে, এবং সেই তালিকায় পদ্মিনীর প্রসঙ্গ এনে দেখানো হচ্ছে, তার নারীত্বের মহৎ দিকটি।এখানে পদ্মিনীর সম্পূর্ণ উপাখ্যানটি তুলে ধরা হচ্ছে, এবং বর্ণনা করা হচ্ছে, আদর্শ স্ত্রী হিসেবে তার চরিত্রের গুণগুলি। আলাউদ্দিনের আক্রমণের খবর পেয়ে পদ্মিনী যখন নিজের কপালকে দোষ দিচ্ছে, এবং বলছে,

---

১। বঙ্গমহিলা, তদেব

১। ঐ

তাকে বিয়ে করার জন্যই তার স্বামী চিতোরের রাজার এমন দুর্ভাগ্য, একথা প্রমাণ করে যে সেই কালেও যে নারী নিজের অপেক্ষা স্বামীর বিপদ, সংসারের বিপদে বেশি ভাবিত হতো, সে আদর্শ নারী। পদ্মিনী নিজের কথা না ভেবে তার স্বামীর কথাই চিন্তা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের সম্মান ও সতীত্ব রক্ষার্থে জহর করেছে, এমন নারীই সমাজে কাম্য। তাই বাঙালি নারীর সামনে বারবার সতীনারীর এই আদর্শকে তুলে ধরার মাধ্যমে তার কর্তব্যগুলিকেও নেপথ্যে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন অর্থ আমরা করতেই পারি।

এই পর্যন্ত বঙ্গমহিলার লেখা দেখলে আমরা সিদ্ধান্ত করতেই পারি, তাঁরা সমসাময়িকের বাইরে ভাবতে পারছেন না। উনিশ শতকে নারীর যে চরিত্র নির্মাণ করা হচ্ছিল, সেখানে নারীর প্রধান গুণ তার সতীত্ব, উনিশ শতকের নারী হবে সুশীলা, বাধ্য। সে মুখ বুজে ভালো কাজ করবে, সংসারের দায়িত্ব সামলাবে হাসিমুখে, এই আশা নিয়েই সেযুগে ‘আধুনিকা’ নারীর চরিত্র নির্মাণ হচ্ছে। বিভিন্ন সাহিত্যে, লেখায় আমরা নারীর চরিত্রের এই দিকগুলির বর্ণনাই পাই।

এই বিষয়ে আমরা প্রথমেই বলতে পারি, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘সুশীলার উপাখ্যান’-টির কথা। এই উপন্যাসে, ‘সুশীলা’ একটি চরিত্র, কিন্তু আমরা শুরুতেই দেখতে পারি, সুশীলা নামটি শুধু চরিত্রের নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি মুখ্য চরিত্রের একটি বড় গুণ ও বটে। সুশীলার রূপ ও স্বভাব বর্ণনা পাই,

> পরমা সুন্দরী না হইলে কি হয়, রূপ অপেক্ষা তাহার গুণ অধিক ছিল। বিশেষ, সুশীল স্বভাব হেতু তাহার পিতা মাতা সকলেই তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

সুশীলার আরও গুণ ছিল,

> পরের কথা পরের গ্লানি সে কদাচ শ্রবণ করিত না; কোন রমণী এতদ্রুপ কথা কহিলে, সে মিষ্ট বাক্য এবং সদুপদেশ দ্বারা তাহাকে

> নিষেধ করিত। সুশীলার সংসর্গে প্রতিবাসিনী রমণীগণের উপকার বই অনুপকার হইত না,

আদর্শ নারীর বেশ কয়েকটি চারিত্রিক গুণের কথা এখান থেকে পাই। যেমন, সুশীল স্বভাব, অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে অকারণ আলাপ না করা।এগুলিকে উনিশ শতকের মানুষ নারীর মহৎ গুণ হিসেবে তুলে ধরছে। ঔপন্যাসিক বিয়ের পরে সুশীলার বর্ণনা করছেন, "ধর্মপরায়ণা সুশীলা সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া, দুই বৎসর পরমসুখে পতিগৃহে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গৃহকর্মের পারিপাট্য এবং সুশৃঙ্খলা দেখিয়া প্রতিবাসী স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।" উপন্যাসে সুশীলা শিক্ষিতা। বিয়ের আগে পর্যন্ত সে লেখাপড়া করেছে। বিয়ের পর তার স্বামীর সঙ্গে সে পুস্তক- আলোচনা করে।

> নিত্য যেরূপ করেন, চন্দ্রকুমারবাবু একদিন রাত্রিকালে ফুললনি এবং করুণার বৃত্তান্ত নামে একখানি গ্রন্থ পড়িয়া প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে শ্রবণ করাইতেছিলেন।

অথচ সুশীলার গর্ভবতী হওয়ার পরে আমরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখি,

> পূর্বে সুশীলা রাত্রিকালে চন্দ্রকুমারের সহিত একত্র বসিয়া কঠিন কঠিন পুস্তক সকল পাঠ করত বিদ্যালোচনাদি করিতেন। কিন্তু মানসিক পরিশ্রম অধিক হইলে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের হানি হয় এই ভয়ে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হইয়া কোনপ্রকার কঠিন পুস্তক পাঠ করিতেন না।

উনিশ শতকের আদর্শ নারী কেমন হবে তা এই উপন্যাসটি হুবহু তুলে ধরে। চন্দ্রকুমারের সুশীলাকে সম্বোধন প্রমাণ করে, শিক্ষিত বাঙালি যুবকের বালিকা, অবোধ স্ত্রী-এর প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। তার এমন স্ত্রী দরকার যে সংসার সামলাবে আবার স্বামীর সঙ্গে কঠিন গ্রন্থের-ও পাঠ সমালোচনা করবে। উনিশ শতকের বাঙালি স্বামী, স্ত্রী-এর মধ্যে প্রেমিকাকেও খুঁজতে চেয়েছে, তাই তার চরিত্রায়ণ হয়েছে এইভাবে। তার শিক্ষা প্রয়োজন হয়েছে স্বামীর

মনোরঞ্জনের জন্য, পরিবারে সকলের সুখ বিধানের জন্য।অপর একটি কথা সেযুগের বাঙালির মনে হয়েছে, নারীকে শিক্ষিত করা হলে, তার সন্তান কখনোই অশিক্ষিত হবে না। যেমন আলোচ্য উপন্যাসে আমরা দেখি,

> শৈশবাবস্থা পর্যন্ত মাতার উপদেশ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম প্রবৃত্তি এমন উন্নত হইয়াছিল যে, সুশীলা আর তাহাকে বাটীতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না।

বলা বাহুল্য এই উক্তি সুশীলার দশ বছরের পুত্রের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। সুশীলার শিক্ষা, তার ধর্মবোধ ক্রমে যে তার পুত্রের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে এবং সে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে অসামান্য হয়ে উঠবে, এমন রত্নগর্ভা নারী তৈরির জন্যই কি তবে নারীর শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিল উনিশ শতক? প্রশ্নটি আমরা করতেই পারি।

এরপর উনিশ শতকে আমরা পাই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের(১৮২৫-১৮৮৪) প্রবন্ধ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহপাঠী এবং সেযুগের আধুনিকতার পীঠস্থান ‘হিন্দু কলেজ’এর ছাত্র। ভূদেব মুখোপাধ্যায় অনেক প্রবন্ধ লেখেন, তাঁর প্রবন্ধগুলিকে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করা হয়েছে, যেমন, ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’, ‘সামাজিক প্রবন্ধ’ ইত্যাদি। ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’-এর ‘বাল্যবিবাহ’ নামে প্রথম প্রবন্ধটিতে তিনি রীতিমত বাল্যবিবাহের পক্ষে কথা বলছেন।

> যাঁরা বাল্যবিবাহপ্রণালীর কেবল দোষ মাত্র দেখেন, ইহার গুণ দেখিতে পান না, তাঁহাদিগকে ইংরাজদিগের নিরবচ্ছিন্ন অনুচিকীর্ষু বলিলে অন্যায্য গালি দেওয়া হয় না।[১]

১। মনস্বিতা সান্যাল, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *প্রবন্ধ সমগ্র,* ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কলকাতা : চর্চাপদ, সেপ্টেম্বর ২০১০ পৃষ্ঠাঃ ৭

প্রবন্ধ শুরুই করছেন একদম আক্রমণাত্মক মেজাজে এবং বাল্যবিবাহের পক্ষে ক্রমাগত যুক্তি দিয়ে চলেছেন। শেষে বলছেন,

> যে দেশে বয়োধিক হইলে বিবাহ হয়, সেই দেশেই বিবাহবন্ধন শিথিল এবং দম্পতী-প্রণয় অন্ধ অনুরাগমূলক বলিয়া অচিরস্থায়ী।[২]

নিতান্তই দেখব যুক্তি দিতে হয় বলে একের পর এক যুক্তির অবতারণা করে চলেছেন। এই গ্রন্থেরই নবম প্রবন্ধটির নাম , *'গৃহিণীপনা'*। এখানে ভূদেব বলছেন,

> বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি তুমিই সংসারের বিষয় স্বয়ং দেখিলে এবং চিন্তা করিলে, তবে তোমার স্ত্রী আর কি করিবেন? শুদ্ধ খেয়ে খেলিয়ে সময় কাটাইবেন? তাহাতে ত তাঁহার বুদ্ধি খুলিবে না- নিজচিত্তজ্ঞতা এবং পরচিত্তজ্ঞতা জন্মিবে না- মন বড় হইবে না। তিনি একটী স্বার্থপর, আদুরে ক্রীড়াসামগ্রী মাত্র হইয়া থাকিবেন।.....
>
> অতএব পত্নীর হস্তে গৃহকার্যের ভার যত দেওয়া যাইতে পারে ততই দেওয়া বিধেয়। তাহা দিলে তুমি নিজে অনেক অবসর পাইতে পারিবে, এবং তাঁহাকেও মানুষ করিয়া তুলিবে।[১]

স্ত্রীজাতির ভালোর প্রতি এমনতর মাথাব্যথা দেখে আমরা অবাক হই। 'শুদ্ধ খেয়ে খেলিয়ে' কথাটি খেয়াল করব। নারীর মন ও বুদ্ধির বিকাশ তখনই হবে যখন তাকে সংসারের ভার নিতে দেওয়া হবে। তাহলে একই সঙ্গে সে স্বার্থপর, শুধু সাজিয়ে রাখার উপাদান হয়ে থাকবে না, পুরুষের 'কাজে' আসবে। পুরুষ 'অবসর' কাটাতে পারবে। তর্ক উঠতেই পারে, নারীকে আলাদা মানুষের সম্মান দিলে আদৌ এই ধরণের কথা তিনি বলতে পারতেন কিনা। নারীর মন বুদ্ধির বিকাশের জন্য এমন তৎপরতা কতখানি নারীর ভালোর জন্য আর কতটা পরিবারের ভালোর জন্য তা বুঝে নিতেও আমাদের দেরি হয় না। কিন্তু শুধু কি ভূদেবকে দোষ

২। ঐ, ৮

১। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, তদেব

দেওয়া যথাযথ? উনিশ শতকের শিক্ষিত মানুষেরা বেশিরভাগই তো নারীর এই গৃহিণীপনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তার জন্য নারীর 'আধুনিকা' সত্ত্বা নির্মাণ হয়েছে। নারীকে নিয়ম করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, কতখানি তার স্বাধীনতার গণ্ডি। নারী যতই শিক্ষিত হোক, তার প্রধান কাজ যে স্বামী-সংসারের সুখ বিধান, একথা নারীকে প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তবে এর ব্যতিক্রমী চিত্রও আমরা পাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), ছিলেন উনিশ শতকের চূড়ান্ত প্রগতিশীল এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহিত্যের নারীরাও সেযুগে দাঁড়িয়ে বিপ্লব করে গেছে। '*বীরাঙ্গনা কাব্য*'-তে পুরাণের নারীচরিত্রদের হাজির করছেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেখানে '*সোমের প্রতি তারা*' কাব্যে বৃহস্পতির স্ত্রী তারা, স্বামীর ছাত্র সোমদেবের প্রতি প্রেমে ব্যকুল। কিন্তু সেই প্রেম সে গোপন করে না, বরং বলে,

এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,- ধর্ম, লজ্জা, ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী[১]

উনিশ শতকে নারীর মুখে এমন কথা বসানো সহজ কাজ ছিল না। নারী যেখানে নিজে অন্যের স্ত্রী হয়েও, ভালোবাসার জন্য, নিজের প্রেমিকের জন্য কুল, ধর্ম, লোক লজ্জা সব ভুলে যেতে পারে। উনিশ শতকের নারীর তো এই স্বাধীনতা ছিল না, যেন নারীচরিত্রের এতদিনের ছক ভেঙে নব নির্মাণ করছেন। কিম্বা দেখব 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' কাব্য। যেখানে এক স্ত্রী অনায়াসে স্বামী-পুত্রকে পরিত্যাগ করছে এবং বলছে, " পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।" স্বামীকে পুত্র সঙ্গে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে বলছে,

লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি
হস্তিনায়, হস্তিগতি! অন্তরীক্ষে থাকি

১। মধুসূদন দত্ত , *মধুসূদন রচনাবলী,* কলকাতা : সাহিত্যম, ২০০৫ , পৃষ্ঠাঃ ১২৯

তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি![২]

এখানে তর্ক হতে পারে, এঁরা সবাই পুরাণের চরিত্র, বাস্তব নয়। কিন্তু যে সময়ে পুরাণের নারীদের ভারতীয় নারীর আদর্শ হিসেবে দেখানো হচ্ছিল, সেই সময়ে নারীর মুখে এমন কথা বসানো সাধারণ মানুষের ভাবনারও অতীত। সেই যুগেও মাইকেলের মত মানুষ নারী চরিত্রের এই কল্পনাতীত দিকগুলি তুলে ধরছেন। উনিশ শতকীয় নারীকে যখন বারবার বোঝানো হচ্ছে, স্বামী-পুত্রের সেবা যত্ন ভিন্ন আর কোনও কাজ নারীর জীবনে থাকতে পারে না, সেখানে এক নারী স্বেচ্ছায় স্বামী-পুত্রকে ত্যাগ করে যাচ্ছে, কিম্বা স্বামীর বর্তমানে অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার যৌনতার ইচ্ছে সর্বসমক্ষে দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করছে, এমন ভাবনা এর আগে এভাবে আসেনি। তাই হয়ত স্বাভাবিকভাবেই মধুসূদন সমকালে নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু এমন যুগের থেকে এগিয়ে সেকালে কতজন ভাবতে পেরেছেন! স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তো নারী চরিত্রের বর্ণনা করেছেন, তাঁর সাহিত্যে। তাঁর সাহিত্যেও নারী সাহসী কথা বলে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ ভ্রমর উনিশ শতকের নারীর পক্ষে অসম্ভব কথাটি বলে, স্বামী যতদিন ভক্তির যোগ্য ততদিনই তিনি ভক্তি পাবেন। উনিশ শতকে বাড়ির বউ এর মুখে এমন কথা বসানো সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু এখানেই তো বিষয়টি শেষ হয় না, ভ্রমর তো আরও বলেছিল তার স্বামীর উদ্দেশ্যে,

দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।[১]

২। মধুসূদন দত্ত , *মধুসূদন রচনাবলী,* কলকাতা : সাহিত্যম, ২০০৫ , পৃষ্ঠাঃ ১২৯

১। *বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, চৈত্র ১৩৮৭, ৫২৯

২। ঐ

সতী হওয়ার অবদমিত ইচ্ছে যে সেকালের নারীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশেছিল, তা সাহিত্যেও পাই। আর তাই বঙ্কিমও তো শেষ পর্যন্ত ভ্রমর সতী এই কথা প্রমাণ করতেই, তার স্বামী গোবিন্দলালকে ভ্রমরের মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে ভ্রমরের সম্মুখে দাঁড় করান,

> গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল। [২]

ভ্রমর যে স্বভাবে-কাজে সতী তা আলাদা করে প্রমাণ দেওয়ার দরকার ছিল না। সমগ্র উপন্যাসে তা পাঠক খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারেন, কিন্তু তবু ভ্রমরের কথা তার সতীত্বের দাবী চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করার জন্য ঔপন্যাসিকের এমন প্লট আমাদের অবাক করে। সতী তৈরির এমন প্রয়াস নজর কাড়ার মত। বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে 'রোহিণীর' মত বিধবা চরিত্র। সমাজের নিয়ম ভেঙে সে নিজের সুখ খুঁজতে চেয়েছিল। বিধবা হওয়ায় তো তার কোনও দোষ নেই, তাহলে কেন শুধু কপালের দোষে সে সারাজীবন পুরুষের ভালোবাসা পাবে না! এই সাংঘাতিক প্রশ্ন তুললেও, শেষ পর্যন্ত রোহিণীদের পরিণতি হয় মৃত্যু, তা বলতেও ঔপন্যাসিকের ভুল হয় না। কিম্বা 'দেবী চৌধুরানী'- তে 'প্রফুল্ল' চরিত্র। কালে কালে সে হয়ে ওঠে বলিষ্ঠ, দৃঢ়। কিন্তু তার চরিত্রের পরিণতি হিসেবেও তো দেখানো হয়, সে আবার শ্বশুরগৃহে ফেরে, পুকুরঘাটে বসে বাসন মাজে। উনিশ শতকের নারীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তৈরি তো সেযুগের এক নম্বর ঔপন্যাসিক-ও তাঁর সাহিত্যে করে উঠতে পারেননি। সুতরাং সাধারণ মানুষ যে নারীর এই স্বাধীনতা মেনে নেবে না, তা তো বলাই বাহুল্য।

> মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন বলতে সাধারণভাবে বোঝাত রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা। কেবলমাত্র এ দুটি কাজের মধ্যেই যে তাদের সমস্ত দিন অতিবাহিত হত, তা হয়।.....

> বস্তুতপক্ষে, খুব কম ক্ষেত্রেই বাঙালি মেয়েদের দৈনন্দিনতার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও পুঁথিগত শিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল। সারা দিনই তাদের ব্যস্ত থাকতে হত গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে।[১]

সুতরাং বাঙালি সমাজের কাছে তাই নারীশিক্ষা নারী স্বাধীনতা শব্দ গুলোই যে অবান্তর ছিল, তা স্বাভাবিক। নারী চার দেওয়ালে বন্দি থাকবে, সাংসারিক কর্তব্য পালন করবে, এর বাইরে কিছু ভাবা উনিশ শতকের শিক্ষিত পুরুষের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাই মহিলাদের পত্রিকাগুলিও এই ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য মেয়েদের সামনে হাজির করেছে, একের পর এক সতীনারীর উদাহরণ। সতীত্বের আড়ালে পরিবার টিকিয়ে রাখার প্রয়াসই যে মুখ্য ছিল, তা বলাই যায়। বঙ্গমহিলার পাতা জুড়েও আমরা তাই এর থেকে আলাদা কোন স্বর পাই না। যদিও বঙ্গমহিলার সময়কাল ছিল উনিশ শতকের সত্তরের দশক। অন্তঃপুর প্রকাশিত হচ্ছে, উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশক বা একেবারে শেষের দিকে। উনিশের শেষ পর্যায়ে এসে আমরা খেয়াল করব, তারা নারী স্বাধীনতা বলতে কি বুঝতে চাইছে এবং নারীর কোন চরিত্রটি নির্মাণ করছে।

অন্তঃপুরের ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধের শিরোনাম, ‘সেকালের রমণী’, এইখানে রচয়িতা আধুনিক নারীর সঙ্গে প্রাচীনকালের নারীর একটি তুলনা করছেন, এবং অবশ্যই প্রাচীনকালের নারীরা কত মহৎ গুণের অধিকারিণী ছিলেন তা বলছেন।

> সেকালে অধিকাংশ রমনীতেই ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সৎ- গুণরাশি একত্র সমবেত দেখা যাইত, এইক্ষণ তাহার বড়ই অভাব। [১]

১। *অন্দরে অন্তরে*, তদেব ১৭০

১। *অন্তঃপুর*, তদেব

প্রাচীনকালের নারী মহান, কারণ তাদের উক্ত গুণাবলীর উপস্থিতি। আধুনিক নারী এই গুণের অধিকারিণী নয়, সেখানেই রচয়িতার আক্ষেপ। এই প্রবন্ধ থেকে আমরা কিছু নতুন তথ্য জানতে পারি এবং তৎকালীন নতুন পরিবার কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারি। যেমন সেই সময়ে অনেকেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গ পরিত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে আলাদা বসবাস করে। উনিশ শতকে এটি একেবারে নতুন তথ্য। অর্থাৎ, পরিবারের ভিতটির বদল বেশ খানিকটা বদলে গেছে সেই সময়ে। এটি নিঃসন্দেহে সাহসী পরিবর্তন। কিন্তু আমাদের তবু হতাশ হতে হয়, কারণ পত্রিকা এই নতুন ধারাকে সহজ ভাবে মেনে নিচ্ছে না। তারা দাবী করছে, পৃথক হওয়ার এই সিদ্ধান্ত নারীকে তার পূর্বজদের থেকে আলাদা করছে, তাই তার চরিত্রে আদর্শ হয়ে ওঠার গুণের অভাব দেখা দিচ্ছে। তাছাড়াও সেকালের নারীরা দিনের বেলায়, সকলের সামনে স্বামীর সঙ্গে দেখা করত না, একালের নারীরা সেই নিয়মও মানে না বলে তাদের আক্ষেপ। কিম্বা বেশ কিছু পুরনো আচার-রীতি এযুগে যে উৎপাটিত হয়েছে, তাই নিয়েও তারা শঙ্কা প্রকাশ করছেন। নারীর এই স্বাধীনতা যখন খোদ মহিলাদের পত্রিকার পাতাতেই নিন্দিত হচ্ছে, সেখানে সমাজে নারীর এই মুক্তচিন্তাকে যে কতটা অপদস্থ হতে হয়েছে, তা আমরা ধারণা করতেই পারি।

অন্তঃপুরের ২য় বর্ষের ৮ম ও ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে, 'নারীজাতির প্রথম কর্তব্য' নামের প্রবন্ধ, যেখানে বলা হচ্ছে, এটি গ্রান্ট অ্যালেনের মত। সেখানে রচয়িতা দেখাচ্ছেন,

> বিবি হুইটমোর বলিলেন, 'আমার মতে স্ত্রীজাতির সর্বপ্রথম কর্তব্য স্বামীরই প্রতি'।
> ইহাতে হুইটমোর সাহেব বলিলেন, 'আমার মতে স্ত্রীজাতির সর্বপ্রথম কর্তব্য সন্তান সন্ততিরই প্রতি'।[১]

১। *অন্তঃপুর*, তদেব

তর্ক হচ্ছে, নারীর কর্তব্য নিয়ে, কিন্তু সেখানেও তা সীমাবদ্ধ স্বামী এবং সন্তানের মধ্যেই। নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উপস্থিতির বিষয় পত্রিকা এক কথায় নাকচ করে দিচ্ছে।

অন্তঃপুরের ৫ম বর্ষের ৭ম সংখ্যায়, 'পত্নীর গুণশীলতা' প্রবন্ধে দেখানো হচ্ছে, ভবভূতি তাঁর সাহিত্যে রামচন্দ্রের মুখে পত্নীর গুণের বর্ণনা করেছেন। তাই প্রাবন্ধিক-ও সেই কথা সমর্থন করে বলেন,

> মনোনীত ও গুণবতী স্ত্রী হইলে তিনি যে স্বামীর হৃদয়-মোহিনী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; ..... পত্নীর জন্য পতি যতদূর কষ্ট স্বীকার করেন, স্বামীর প্রীতি উৎপাদন ও শ্রান্তি দূর করিতে পত্নীর ততোধিক যত্নবতী হওয়া কর্তব্য।..... গৃহধামকে পত্নীর এরূপ করিয়া রাখা উচিত, যেন সংসারের কার্যে বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে আসিলে পতির নিকট গৃহধাম সুখময় ও পত্নী সহবাস পরম সুখালয় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।[১]

প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই আমরা নারীর সেই একটি কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া দেখতে পাই। উনিশ শতকের শিক্ষিত পুরুষ এমন নারীকেই সহধর্মিণী হিসেবে চায়, যে নিজের দায়িত্বে সংসার যেমন সুন্দর, বাসযোগ্য করে তুলবে, তেমনই শিক্ষিত স্বামীর মনের কথা বুঝে তাকে যথার্থ আশ্রয় দিতে পারবে। নারীর এই পত্নী, মাতৃ রূপকেই আরাধনা করা হয়েছে, আর সেই কল্পনাকে বাস্তবায়িত করে রক্ত-মাংসের আদর্শ স্ত্রী তৈরি করার দায়ভার যেন কাঁধে তুলে নিয়েছে, উনিশ শতকের মহিলাদের পত্রিকা।একই সংখ্যায় এমন আরও একটি প্রবন্ধ আমাদের কথার যুক্তির সাপেক্ষে তুলে ধরা যেতে পারে, সেটি 'গৃহস্থালীর কথা'। এখানে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সংসারে কোন ঘরে কি কি দ্রব্য রাখা যেতে পারে, বিছানার তোষক, বালিশ কেমন হবে, মশারি কেমন হবে সাদা না রঙিন ইত্যাদি। এছাড়াও বলা হচ্ছে, রান্নাঘরে কি কি রান্নার

১। ঐ

সামগ্রী থাকবে, সেগুলির ব্যবহার কেমন হবে। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, আদর্শ গিন্নী নির্মাণের যাবতীয় দায়িত্ব পালনের কাজ অন্তঃপুর করে চলার চেষ্টা করে গেছে।

অন্তঃপুরেরই উক্ত সংখ্যায় অপর একটি প্রবন্ধ, 'সূতিকা গৃহ'। আপাতদৃষ্টিতে নারীর স্বাস্থ্যের কথা বলার আড়ালে এমন কিছু কথা বলা হচ্ছে, যা নারীর জীবনের প্রধান কর্ম বলে বিবেচিত হয়। যেমন,

> সন্তানহীনা হওয়া নারী- জীবনের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। বন্ধ্যা নারী লোকচক্ষে হেয় এবং সময় সময় এইরূপ নারীকে নির্যাতনও সহ্য করিতে হয়।[১]

পত্রিকা বন্ধ্যা নারীর সামাজিক অবস্থান, তার দুর্দশার ছবিটি উল্লেখ করছে, কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাচ্ছে। একবারের জন্যও এই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজছে না, বা এমন ভাবনা নারীর জীবনে কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার সম্যক আলোচনা করে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কোনরকম চেষ্টা করছে না। বরং বলছে, বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সূতিকা গৃহ নির্মাণের কথা, যাতে মা এবং শিশু উভয়েই সুস্থ থাকে এবং নারীকে অকালে সন্তান হারাতে যেন না হয়। আমাদের সন্দেহ নারীর স্বাস্থ্যের এই চিন্তার কারণও আসলে নারীর জন্য যতটা নয়, ততটা তার সুস্থ সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য। সেকালে দাঁড়িয়ে পত্রিকা তাহলে আর পাঁচটি পত্রিকা বা মানুষের থেকে আলাদা কি বলছে, সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে।

অন্তঃপুরের ৬ষ্ঠ বর্ষের ১ম সংখ্যায় যেমন দেখি, 'রমণীর পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য' নামের প্রবন্ধটি। এখানেও নির্বিবাদে বলা হচ্ছে,

> গৃহই রমণীর কার্যক্ষেত্র,..... সন্তানপালন রমণীর জীবনের সর্ব প্রধান মহৎ কার্য।[২]

১। *অন্তঃপুর*, তদেব

শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তুলে বলা হচ্ছে, স্ত্রী ছায়ার মত স্বামীর অনুগত হবে, সখীর ন্যায় তার পাশে থাকবে এবং দাসীর ন্যায় তার সেবা করবে। এই বাক্যটির থেকে আমরা স্পষ্ট ধারণা পাই, উনিশ শতক নারীর যে চরিত্র নির্মাণের ক্রমাগত চেষ্টা করছিল, তাতে নারীর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই আশা করা হয়েছে। পত্রিকাগুলি সেই কাজেই ব্রতী, তাই অন্দরের নারীকে তারা ক্রমে 'আদর্শ' করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

রাসসুন্দরী লিখেছিলেন, যে সকল মেয়েরা সেকালে পুরুষের অধীন থাকত, এবং তার আনুগত্যে থাকত, সব কথা শুনে চলত, তারাই ছিল, 'লক্ষ্মী' মেয়ে। বস্তুত উনিশ শতকে এই 'লক্ষ্মী' মেয়ে গড়ে তোলার প্রয়াস বিভিন্ন সাহিত্যিকরাও করে গেছেন। যেমন, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মনোরমার গৃহ', (কলকাতা, ১২৯৯)।এই গ্রন্থে মনোরমা 'লক্ষ্মী' মেয়ের প্রতিনিধি। কিম্বা অন্যান্য মেয়েদের পত্রিকাও এমন লক্ষ্মী মেয়ের হয়ে সওয়াল করেছে। বামাবোধিনী পত্রিকায়, সুশীলা, নির্মলা, জ্ঞানদা প্রভৃতি কাল্পনিক চরিত্রগুলি এই ধারণাকেই পুষ্ট করে গেছে। ফলে নারী রান্নঘরের মধ্যেই থাকবে এবং তার সেই রান্নাঘরের চার দেওয়ালকে আরও মজবুত বানানোর দায়িত্ব নিচ্ছে পত্রিকাগুলি।

আমরা দেখব উনিশ শতকের পত্রিকা কিভাবে নারীর জীবনে রান্নাকে গুরুত্ব দিয়ে মহিলাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। পরিচারিকা মন্তব্য করেছিল, রান্নাকে যেন কেউ হীনকাজ মনে না করেন। রান্না করতে কতখানি গুণের এবং দক্ষতার প্রয়োজন হয়, তা জানাতেও তারা ভোলেনি। পিতা মাতা, স্বামী প্রত্যেকের সেবার জন্য রান্না এবং ভালো আহার পরিবেশনের শিক্ষা থাকা যে আবশ্যক তা তারা বারবার উল্লেখ করেছে, এবং যে নারী ভালো রান্না পারে না, সে যে আসলে আশিক্ষিতা-এমন মন্তব্যও পরিচারিকার মত প্রথম সারির ব্রাহ্ম

২। *অন্তঃপুর*, তদেব

পত্রিকায় পাওয়া যায়। (ঘরকন্নার কাজ, পরিচারিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫, পৃষ্ঠাঃ ৪৩)। অবশ্য এতে আমরা আশ্চর্য হই না, যখন দেখি উনিশ শতকের বিভিন্ন লেখায় নারীর রান্নাকে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার বিবরণ পাই। যেমন, রাসসুন্দরীর লেখায় তিনি একেবারে বাস্তব পরিবারের চিত্র, নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

> আমার দেবর, ভাশুর কেহ ছিল না বটে, কিন্তু চাকর চাকরানী প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশজন বাটীর মধ্যে খাইত, তাহাদিগকে দু বেলাই পাক করিয়া দিতে হইত।[১]

আমাদের শিহরণ জাগে একজন মহিলা দুবেলা এতজন মানুষের জন্য রান্না করত শুনে। কিন্তু এখানেই তো থেমে ছিল না,

> এক সন্ধ্যা দশ বারো সের চাউল পাক করিতে হইত। এদিকে বাটীর কর্তাটির স্নান হইলেই ভাত চাই,অন্য কিছু আহার করিতে বড় ভালবাসিতেন না। এ জন্য অগ্রে তাঁহার জন্য এক প্রস্থ পাক হইত। এই প্রকার পাক করিতেই বেলা তিন চারিটা গত হইত।[২]

রান্নার এহেন আয়োজন একা হাতে এক মহিলার সামাল দেওয়া যে সহজ কাজ নয়, তা আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু সেকালের পক্ষে এটি অস্বাভাবিক ছিল না, তাই রাসসুন্দরীও অনায়াসে বলতে পারেন, এমন রান্নার আয়োজন করতে করতে অনেক দিন তিনি নিজে খাওয়ার ফুরসৎ পেতেন না। বাড়ির বউ তার কর্তব্য, রান্না, পতির সেবা করে যাবে বিনা প্রতিবাদে, বিনিময়ে তার ভাগ্যে জুটবে অবহেলা- এ যেন উনিশ শতকের জীবন যাত্রার মূল কথা, অথচ নারী মুক্তির বিরোধীরা তো কই কখনো নারীর এই বঞ্চনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। নারী জন্মই তো অপরের সেবা করার জন্য। নারীমুক্তির পক্ষ এবং বিপক্ষ শ্রেণী এই জায়গায়

১। রাসসুন্দরী, তদেব, ২০

২। ঐ ৩৬-৩৭

এসে এক হয়ে যায়। অন্তঃপুরের নারীর এই অবহেলা, পরিশ্রম তাদের মনে কোনও প্রশ্নের উৎপাদন করে না। কিন্তু মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলি তো নারীর এই দুর্দশা সম্পর্কে অবগত, তবু তাঁরাও কি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন?একবার খেয়াল করা যাক।–

অন্তঃপুর পত্রিকায় আলাদা করে 'রন্ধন' নামের কলাম থাকত, যেখানে মহিলাদের নিত্যনতুন রান্নার প্রণালী শেখানো হতো। একটি ছকের সাহায্যে আমরা বিষয়টি দেখতে পারি,-

পত্রিকা	রান্নার বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অন্তঃপুর ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা	আইরিশ ষ্টু	২৪
ঐ, ৪র্থ সংখ্যা	১) মাংসের কারী ২) কলাকন্দ ৩) মতিচুরের নাড়ু	৮৯
ঐ, ৫ম সংখ্যা	১) পাকা আমের বড়া ২) ডিমের কচুরী ৩) ডিমের বল ৪) ডিমের নিমকি ৫) রুটির মোরব্বা ৬) ডিমের সরবত	১০৩-১০৪
ঐ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	সহজ উপায়ে মাংস পাক	১৩৭
ঐ ৭ম সংখ্যা	লেখাটি অপ্রাপ্ত	১৬১
ঐ, ১০ম সংখ্যা	মাংসের চপ	২৩২

ঐ, ১১শ সংখ্যা	১) খৈয়ের মুড়কী ও মুড়কীর মোয়া ২) খৈভাজা ৩) মুড়ীভাজা	২৫৯-২৬০

উপরের ছকটি থেকে আমরা ধারণা পাই, সেকালের নারীকে রন্ধন পটীয়সী করে তোলার জন্য পত্রিকাও অসামান্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের শিক্ষা দানের পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে তাই অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রতি সংখ্যায় এক বা একাধিক নানাবিধ পদের রন্ধনপ্রণালী শেখানো হচ্ছে। এ তো গেল রান্না শেখানোর প্রসঙ্গ। রান্না সম্পর্কে পত্রিকা কি ভাবছে, তাও আমরা দেখতে পাই এখানে।

অন্তঃপুরের ষষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যায়, প্রকাশিত হচ্ছে, *'রন্ধনে রমণী'* শীর্ষক প্রবন্ধটি। শুরুতেই আক্ষেপ একালের শিক্ষিতা এবং অর্ধ শিক্ষিতা মহিলারা রান্না বিষয়ে উদাসীন। পুরানকালের প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রশ্ন করছেন, পাচক-পাচিকা থাকলেও কি মহিলাদের রান্না থেকে পুরোপুরি অবসর নেওয়া উচিত? স্বামী-পুত্রের যদি নারীর হাতের রান্না খাওয়ার ইচ্ছে হয়, তাহলে কি তাদের বঞ্চিত করা উচিত? শেষে সিদ্ধান্ত স্বরূপ ঘোষণা করছে,

> ধনবানই হউক আর নির্ধনই হউক, প্রত্যেক বঙ্গরমণীগণেরই রন্ধনে পারদর্শিতা বিশেষ রূপে প্রয়োজন আছে। [১]

অর্থাৎ নারী যতই শিক্ষিত হোক, বা আধুনিক হোক, তার গতি রান্নাঘরের চার দেওয়াল, আর এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে, পত্রিকা কখনোই ক্লান্ত হচ্ছে না, বরং 'অশিক্ষিতা' দের রন্ধনে পারদর্শী করে তোলার জন্য প্রতি সংখ্যায় হাজির করছে নতুন নতুন মুখরোচক খাবার। অবশ্য

১। *অন্তঃপুর*, তদেব

‘আদর্শ’ নারী গড়ে তোলাই তো এঁদের অঙ্গীকার, অতএব সেই চেষ্টায় কোন ত্রুটি তারা রাখছেন না।

শুধু একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। রান্নাঘর বা বড় অর্থে ঘর-গৃহস্থালিকে উনিশ শতক থেকে বেশ খানিকটা মর্যাদার আসনে রাখা হচ্ছিল। যা নিতান্তই ‘দাসী-বাদীর কাজ’-এর সমতুল্য তাকে হঠাৎ করে মহিলার জীবনে সবচেয়ে মহৎ কাজ এবং যে মহিলা এই কাজটি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করে তাকে দেবীর স্থান দেওয়া হচ্ছিল এবং তা যেন অত্যন্ত সচেতনভাবেই। আর মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলি ছিল এর বাস্তব রূপ নির্মাণের দায়িত্বে, এবং তা এদের প্রতিটি পাতায় দ্রষ্টব্য।

তবে এর থেকে অনিবার্যভাবে মনে একটি প্রশ্ন আসে, সেই সময়ে মেয়েদের কাজকে হঠাৎ এত গৌরবময় করে দেখানো হচ্ছে কেন? আমাদের জানতে ইচ্ছে করে এর পেছনের অভিসন্ধিটি আসলে কি ছিল। অবশ্য আমরা এতক্ষণ ধরে পাওয়া সব রকমের লেখার ভিত্তিতে এর একটি কারণ খোঁজার চেষ্টা করতে পারি।

উনিশ শতকে মেয়েরা শিক্ষা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ- কর্তাদের সর্বপ্রথম যে আশঙ্কাটির উদ্রেক হয়েছে, শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা আর ঘরের চার দেওয়ালে বন্দী থাকবে না। চিরাচরিত ‘মেয়েলি’ বলে চিহ্নিত কাজের প্রতি তাদের আর কোন শ্রদ্ধা থাকবে না। হয়ত এই ভয় থেকেই একদল মানুষ ক্রমাগত নারী স্বাধীনতার বিপক্ষে কথা বলে গেছেন। আর হয়ত নারী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষার পরিপন্থীরাও নারীর শিক্ষার অধিকার চাইতে এই দুর্বলতার সুযোগ মত ব্যবহার করে গেছেন, তাই বলা হয়েছে, শিক্ষা নারীর চরিত্রের উন্মেষ ঘটাবে। নারীর জীবনের যা পরম কাজ, সতী হয়ে পতির সেবা- সেই কাজ সে করবে আরও সুচারুভাবে,

আরও নিপুণ করে। তাই হয়ত মেয়েদের শেখানো কাজের মধ্যে ঘর- গৃহস্থালি সামলানো, তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা ইত্যাদি 'মেয়েলি' কাজের উপর এতটা জোর দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। আমরা তো রাসসুন্দরীর লেখাতেই পেয়েছি,

> তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেও পুরুষের কাজ করিবেক। এত কাল ইহা ছিল না, একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিনসে জড়ভরত, আমাদের কালে এত আপদ ছিল না। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। দিনে দিনে বা আর কত দেখিব। এখন যেমন হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না।[১]

সুতরাং, 'জাতি' কেবল পুরুষদের হয়, এবং এই 'জাতি' রক্ষায় মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই। তারা নেহাতই তুচ্ছ। এই ভাবনা মেয়েদের মনে কিভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল তার প্রমাণ পাই, আমাদের আলোচিত পত্রিকা, 'বঙ্গমহিলা'র পাতায়। যেখানে শ্রীমতী মায়াসুন্দরী লেখেন,

> আমরা কি কুক্ষণেই নারী হইয়া এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যদি পরমেশ্বর আমাদিগকে সহিষ্ণুতা গুণ অধিক পরিমাণে না দিতেন, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা যে কি হইত, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। আমাদিগের জন্মাবধিই পোড়া কপাল। ভূমিষ্ট হইবামাত্র পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলেই বিমর্ষ। মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি পর্যন্ত হইল না। পিতা বলিলেন, আহা একটা পুত্র না হইয়া 'একটা মেয়ে' হইয়াছে।[২]

এই তো ছিল সেই সময়ে মেয়েদের বাস্তব অবস্থা। পুত্র না হয়ে মেয়ে হয়েছে সেটিই যেন ছিল পিতা মাতার অশেষ বোঝা। তবে গল্পটি তো আমাদের অচেনা লাগার কথা নয়।

১। রাসসুন্দরী, তদেব, ২২

২। *নারীজন্ম কি অধর্ম, বঙ্গমহিলা,* শ্রাবণ ১২৮২, ৯৩

উনিশ শতককে হাজার দোষ দিলেও , একুশ শতকে এসেও কি আমরা এমন জায়গা তৈরি করতে পেরেছি, যেখানে ভারতবর্ষের সর্বত্র, ছেলে-মেয়ের জন্মে একইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে এখনো আমরা কন্যা ভ্রূণের বাঁচার অধিকার, বা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথা মত, 'বেটী বাচাও, বেটী পড়াও' অভিযানে সামিল হওয়ার প্রয়োজন হতো না। খোদ একুশ শতকেই যখন মহিলাদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি, সেখানে উনিশ শতক যে এত তাড়াতাড়ি এই পিছুটান কাটিয়ে উঠবে না , তা তো নিতান্তই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

তাই তো যখন সেকালে শরৎকুমারী চৌধুরানী একটি সংলাপ তোলেন, আমাদের কাছে উনিশ শতকের বাস্তব পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে যায়,

> না গো ছোটকাকী, সে কথা আর ব'ল না- আমাদের যেমন অদৃষ্ট, বউয়ের আর আবার বেটাছেলে এ জন্মে হবে! যা হয়, একটা মেয়ে হয়েছে।[১]

যদিও এই প্রবন্ধে শাস্তিস্বরূপ মেয়ের মাকে বলি দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু এর একশ বছর আগেও (১৭৯২সাল) কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে মাকে শাস্তি পেতে হত। উনিশ শতকে এসে ভাবধারা, চিন্তার কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু মৌলিক আদর্শটি কোথাও গিয়ে একই থেকে গেছিল। তাই জন্যই বিয়ের পর পুত্রের বদলে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া সেকালেও ছিল পাপ।

কারণ,

> বংশ রক্ষার জন্য বউয়ের আদর, নইলে পরের মেয়ে ঘরে এনে জঞ্জাল বৈ তো নয়।[২]

১। *আদরের না অনাদরের?, সাধনা,* মাঘ ১২৯৮, ২৫১-২৫২

২। *সাধনা,* মাঘ১২৯৮, ২৬২

আর কে না জানে বংশ রক্ষা একমাত্র করতে পারে পুত্র সন্তান। কন্যা সন্তানের সেখানেও কোনও অধিকার নেই। তাই উনিশ শতকেও এসে মানুষের মানসিকতার খুব বড় একটা ফারাক হচ্ছে না।

উনিশ শতকে বাঙালি পুরুষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, সে নতুন যুক্তি বোধ, নতুন দর্শন শিখছে, ফলে নারী সমাজের একটা যে বদল প্রয়োজন তা অনুভব করছে। কিন্তু এই বদলটা কখনোই উপনিবেশের পুরুষ প্রজার মত করে হবে না। বাঙালি পুরুষের চরিত্র যতই সাহেবের অনুকরণে, তার পোশাক যতই বিলেতি ধাঁচের হোক না কেন, উনিশ শতকিয় নারীর চরিত্র নির্মাণ বিদেশি মেম এর আদলে নারীর সনাতনী, ঐতিহ্যবাহী যে রূপ তা অনুযায়ী হবে না। কারণ নারীর রূপ দাম্পত্য- সন্তানপালনের পরিপন্থী। নারীকে পুরুষ সেই রূপেই দেখতে চেয়েছে। তাই সে শিক্ষিত হয়েছে তখনই যখনই পুরুষ চেয়েছে। নারী কতটা শিখবে, কি কি শিখবে তাও বলে দিয়েছে পুরুষ। উনিশের মাঝামাঝির পর থেকে যখন ধীরে ধীরে শিক্ষিত নারীর স্বর পাই, সেই স্বর ও কি পুরুষদের স্বরের থেকে আলাদা? আমরা তো তেমনটা দেখি না। বরং পুরুষ যতখানি অধিকার দিচ্ছে, সেটিই নারীর জীবনের পরম সম্পদ বলে বিবেচিত হচ্ছে। আর *বঙ্গমহিলা, অন্তঃপুর* ইত্যাদি পত্রিকা কালের নিয়মে নারী শিক্ষার স্বপক্ষে যতই কথা বলুক, তাদের পত্রিকা থেকেই জানা যায়, শিক্ষিত নারীর কোন চেহারা তারা নারী মানসে তুলে ধরতে চেয়েছে। নতুনত্বের তাগিদ ছিল সময়ের দাবী, সেই দাবী মেনেই তারা এগোচ্ছে। পরিবারের মূল কাঠামো ভেঙে নারীর অস্তিত্বের নব নির্মাণ তারা করতে পারেনি, সেখানেই তাদের সীমাবদ্ধতা। তবু তারা যে আলাদা করে নারীর কথা ভেবেছে, তার দৈনন্দিন কাজকর্মকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং যেমনই হোক না কেন, নারীকে অন্তত শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছে, সেটিই হয়ত এদের কৃতিত্ব। উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে নারী জাতিকে অন্তত একটি

ধাপ এগিয়ে দিতে যে তারা সক্ষম হয়েছে, একথা তাই স্বীকার না করে কোন উপায় থাকে না। ১৯০১ এর একটি সমীক্ষায়, দেখানো হয়েছিল, বঙ্গদেশে ১১৫৬ জন মহিলা শিক্ষক এবং বিভিন্ন ধরণের (ডিপ্লোমা, লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট ধারী) চিকিৎসক ছিলেন। (Census of India, 1901, vol 6A, pt 2 Calcutta : Bengal Secretariat Press,1902, pp428,431). সুতরাং পরিবর্তন আসছিলো। এতদিন ধরে চলে আসা একটা ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করতে সময় লাগারই কথা। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোচ্য পত্রিকা দুটি সেই ভিত টিকেই ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করেনি, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বরং *'বঙ্গমহিলা'* থেকে *'অন্তঃপুর'* এর যাত্রা ক্রমে উত্তরণের পথ, পরিবর্তনের পথে এগচ্ছিল, তাদের অসংখ্য সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এটি ছিল অনস্বীকার্য। তাই সে কালের সাপেক্ষে তাদের গুরুত্বও অপরিসীম।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম তিনটি অধ্যায়ে আমরা দেখলাম, উনিশ শতকে প্রকাশিত দুটি মাসিক পত্রিকা বঙ্গমহিলা এবং অন্তঃপুর সেই সময়ে দাঁড়িয়ে মহিলাদের শিক্ষা এবং নারীত্ব নির্মাণ প্রসঙ্গে কি বলছে। সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকা থেকে তারা কতখানি নতুন কথা বলছে, তা আমরা অল্প পরিমাণে আলোচনা করলেও, এই অধ্যায়ে তা বিস্তারিত ভাবে দেখার চেষ্টা করব। এর পাশাপাশি আমরা সর্বপ্রথম যে বিষয়ে নজর দেব, তা হল বঙ্গমহিলা এবং অন্তঃপুরের পাতায় প্রকাশিত পাঠিকা মহিলাদের রচনাসমূহের দিকে। পত্রিকা দুটি যে নারীর মধ্যে লেখার ইচ্ছে ক্রমশ জাগিয়ে তুলছিল, তা আমরা এই লেখাগুলো দেখলেই খানিকটা অনুমান করে নিতে পারি।

বঙ্গমহিলার প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা থেকেই দেখি আলাদা করে জায়গা বরাদ্দ থাকছে মহিলাদের লেখা প্রকাশের জন্য, এবং পত্রিকা এই অংশের নামকরণ করছে, 'বামাগণের রচনা' এই নামে। সাধারণত এই অংশে কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে, তবে সর্বাধিক আশ্চর্যের যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের প্রশ্ন থেকে যায়, এই অংশে যেসকল মহিলা লেখা প্রকাশ করছেন তাঁদের নাম প্রকাশিত হচ্ছে না। যেমন, ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হচ্ছে, 'আশা' নামের একটি কবিতা, তার রচয়িতার নাম দেওয়া রয়েছে, 'শ্রীমতী-'। পরের কবিতা 'ঈশ্বরের প্রতি' তেও আমরা কোন নাম পাই না। শুধু এখানেই নয়, প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই রচনায় রচয়িতার নাম উল্লেখ করা হচ্ছে না। এখানে আমাদের মনে সংশয় তৈরি হয়, তাহলে কি উনিশ শতকের নারী লিখতে পারে বা কবিতা লিখতে পারে এই কথা মেনে নিতে সমাজের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদেরও সমস্যা হচ্ছিল? তাঁরা তখনও জনসমক্ষে নিজেদের সাহিত্য রচনার কথা প্রচার করতে পারছিলেন না? কিম্বা হয়ত পত্রিকাই নারীর কথা ভেবে তাঁদের পরিচয় গোপন রাখাই

বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিল, যাতে তাঁদের সামাজিক, পারিবারিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে না হয়। কিন্তু এই যুক্তিটি যথাযথ বলে মনে হয় না, যখন দেখি এই পত্রিকাতেই চতুর্থ সংখ্যায়, 'বামাগণের রচনা' অংশে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে, 'নারীজন্ম কি অধর্ম' শিরোনামে, এখানে রচয়িতার নাম দেওয়া আছে, 'শ্রীমতী মায়াসুন্দরী'। যদিও তর্ক উঠতেই পারে যে এটি আদৌ রচয়িতার আসল নাম না তিনি ছদ্মনামে রচনা প্রকাশ করেছেন! যেহেতু আমাদের কাছে এই বিষয়ে কোন নিশ্চিত তথ্য নেই, তাই আমরা এটিকে আপাততভাবে রচয়িতার প্রকৃত নাম হিসেবে ধরে নিতে পারি, কিন্তু তা হলেও তো এটি ব্যতিক্রম। বঙ্গমহিলার অন্যান্য রচনায় রচয়িতাদের নাম অনুপস্থিত। এবং পত্রিকার ভূমিকা এতে আদৌ কতখানি আছে, সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ থেকেই যায়। সুতরাং মহিলাদের নাম গোপনের কারণ যাই থাক, একটি ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত, উনিশ শতকের নারী তাঁর শিক্ষা, প্রতিভা নিয়ে তখনও দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি, কিম্বা হয়ত সমাজে সেই গ্রহণীয়তার জায়গাও তৈরি হয়নি। যেমন কৈলাসবাসিনী দেবী তো মন্তব্য করেছেন,

> তৎকালিক পণ্ডিতগণ কহিতেন যে সংস্কৃত শাস্ত্রে অবলা জাতির অধিকার নাই,.....আরও কহিতেন যে স্ত্রীগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিলে অকাল বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়।..... সুতরাং এই প্রকার নিদারুণ বাক্য স্মরণ করিয়া বুদ্ধি বিহীনা অবলাগণ বিদ্যাভাসে নিতান্তই আপনাদিগের অনধিকার জানিয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইত না,.....। [১]

তাই উনিশ শতকের নারীকে তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করতে গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সে শিক্ষিত হয়ে যতই সাহিত্য রচনা করুক, সমাজ তখনও পুরোপুরিভাবে তাঁর এই স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার জায়গায় অবস্থান করছিল না। অন্যান্য যে সকল মহিলারা স্বাধীনভাবে

১। *বঙ্গমহিলা*, তদেব

সাহিত্য-রচনা ও প্রকাশ করছিলেন তাঁরা (কৈলাসবাসিনী, জ্ঞানদানন্দিনী, স্বর্ণকুমারী, শরৎকুমারী প্রমুখ) প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন ব্রাহ্ম। তাই তাঁদের সামাজিক অবস্থানের সাপেক্ষে উনিশ শতকের বাকী মহিলাদের বিচার করা যাবে না। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই তাই বঙ্গমহিলার সেই সাহস সঞ্চয় করতে আরও খানিকটা সময় লেগে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালি নারী যে অন্তত পত্রিকায় লেখা ছাপানোর মত সাহসী পদক্ষেপ নিচ্ছিল, সেটিই ছিল আশার কথা।

বঙ্গমহিলার পাতা ওলটালে দেখব মহিলারা নানা রকমের বিষয় নিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা যেমন স্বরচিত কবিতা লিখেছেন, তেমনই জানিয়েছেন সমাজের বিভি প্রসঙ্গ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত। যেমন 'নারীজন্ম কি অধর্ম', 'পতি সতীর একমাত্র গতি' ইত্যাদি। তবে বঙ্গমহিলার প্রথম বছরের সংখ্যা গুলিতে 'বামাগণের রচনা' অংশে বেশিরভাগ কবিতাই আমরা পাই। যেমন, 'আশা', 'ঈশ্বরের প্রতি', 'কবি অভাবের কবিতা', 'ভারতমাতা', 'মনুষ্য জীবন', 'মনের প্রতি উপদেশ' ইত্যাদি। একই জিনিস আমরা লক্ষ্য করি, বঙ্গমহিলার দ্বিতীয় বর্ষের সংখ্যাগুলিতেও। এখানেও বেশিরভাগ 'বামাগণের রচনা'ই কবিতা। তবে এই বছরে একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এখানে মহিলারা অনেকেই নিজেদের নাম প্রকাশ করছেন। যেমন, ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যায়, 'আমি ভাল বাসি না?' কবিতায় কবির নাম পাই, 'শ্রীমতী সুর-সোহাগিনী দেবী', ২য় বর্ষের ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমি কি উন্মাদিনী' কবিতায়, কবির নাম 'শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী'। উক্ত বর্ষেরই ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতা 'আমি তো বিধবা'র কবির নাম 'শ্রীমতী কামনা দেবী'। প্রথম বছরের তুলনায় দ্বিতীয় বছরে নারীসমাজের এই অগ্রগতি খুবই স্বস্তির। এক বছরের মধ্যে মহিলারা নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রকাশে যে অনেকটাই দ্বিধাহীন হয়েছিলেন, তার কৃতিত্ব অবশ্যই পত্রিকার প্রাপ্য। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে নারীর মনের কথা জানানোর পরিসরটুকু তাঁরাই তৈরি করে দিতে পেরেছিলেন এবং পত্রিকার

পাতায় স্বজাতির লেখা উনিশ শতকীয় নারীকে যে উৎসাহ জুগিয়েছিল, তা তো আমরা বলতেই পারি।

আমরা দেখব, মহিলাদের রচিত বিষয়গুলি।– ২য় বর্ষের ৮ম সংখ্যায়, শ্রীমতী কামনা দেবীর লেখা, 'আমি তো বিধবা' কবিতাটিকেই দেখা যাক,- এটি কবিতা হলেও, প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে কবিতাটি রচিত হয়নি। বরং সমসাময়িক সমাজে বিধবাবিবাহ প্রথার প্রতি মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখব, কবি বিধবাবিবাহ প্রথার পক্ষে কথা বলছেন না, বরং ভারতীয় সতীত্বের জয়গান গেয়ে বঙ্গনারীকে বলছেন এমন অনাচার না করতে। বিধবার বিয়ে উচিত নয়, এবং কেন বিধবার পুনরায় বিয়ে করা উচিত নয় সেই বিষয়ে সমগ্র কবিতা জুড়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করছেন।

এখন তরুণ যৌবন আমার,
এখন কামনা হৃদয়ে অপার।
তবে কেন প্রাণ চাহে নাকো আর
ধরিতে হৃদয়ে বরিতে আবার
পতিভাবে পুনঃ, ধিক! অন্য জনে;
এই কি বাসনা রমণীর মনে?[১]

আমরা অনুমান করতে পারি, কবি নিজেও হয়ত একজন বিধবা, কিন্তু তবুও বিধবা বিবাহের নতুন প্রথা তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারছেন না। হয়ত পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় থাকতে থাকতে নারীর নিজের স্বরটিও পুরুষের দ্বারাই অলক্ষ্যে চালিত হচ্ছিল। তাই বৈধব্যের অসীম দুঃখ- যন্ত্রণার সাক্ষী হয়েও সতীত্ব রক্ষার্থে আর একবার বিয়ের প্রস্তাব মেনে নেওয়া তাঁর কাছে দুরাচারের সমান হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছিল। তাঁর কাছে বিধবার বিয়ে এবং গণিকা বৃত্তি স্বীকার করে নেওয়া একই ব্যাপার।

১। *বঙ্গমহিলা*, তদেব ১৮৬-৮৭

সতী কি ধরিবে গণিকার বেশ?
অবলার প্রতি এই উপদেশ? [১]

যে সকল হিন্দু পুরুষ বিধবাবিবাহে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের প্রকারান্তরে 'কুলাঙ্গার' বলে সম্বোধন করতেও তিনি পিছপা হচ্ছেন না। সুতরাং বিধবাবিবাহের মত সমাজ সংস্কার আন্দোলন যে সমাজের সকল নারীর বাহবা অর্জন করতে অসমর্থ হয়েছিল, তা এই একটি রচনা থেকেই স্পষ্ট হয়। আর ঠিক এই কারণেই হয়ত, আলোচ্য বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় কোনও এক অজ্ঞাত নারীর দ্বারা 'শিবচতুর্দশী' কবিতার গৌরব বর্ণিত হয়। যে নারীর কাছে পতি পরম সৌভাগ্যের প্রতীক, সেই নারী যে শিবের গুণগান করবেন তাই তো স্বাভাবিক।

২য় বর্ষের ১১শ সংখ্যায়, রচয়িতার নাম ব্যতীত প্রবন্ধ, 'স্ত্রী ও পুরুষ' প্রকাশিত হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে স্ত্রী ও পুরুষের যেমন শারীরিক পার্থক্য রয়েছে, তেমনই আছে তাদের মানসিক প্রভেদ। নারী পুরুষের অপেক্ষা শুধু দৈহিক ভাবেই খাটো নয়, নারীর স্বভাব, মনও পুরুষের তুলনায় অনেক কোমল।

> পুরুষ কঠোর, স্ত্রী প্রেমময়; পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা; পুরুষ নির্ভীক, স্ত্রী ভীরুস্বভাবা। মনুষ্যের মনের ভাব সমূহের মধ্যে যেগুলি কোমল ভাবাপন্ন, সেইগুলি নারীর হৃদয়ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভূত হয়।[২]

১। ঐ

২। *বঙ্গমহিলা*, তদেব

নারীর চরিত্রের এই দিকগুলি প্রাবন্ধিক সমালোচনার জন্য বলছেন না, বরং নারীর চরিত্রের এই গুণগুলিই যে নারীকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছে তাই তাঁর অভিমত। সমাজে যে সকল মানুষ বলেন নারীপুরুষের এই ভেদ সমাজের তৈরি করা, তিনি সেই মতটিও গ্রহণে রাজি নন। নারীর উক্ত গুণ নারীর একান্তই প্রকৃতিগত এই তাঁর মত। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত তাঁর নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য তা আমাদের পথ দেখায়। নারীর হৃদয় কোমল বলে যারা নারীর বিজ্ঞানশিক্ষা উচিত নয় বলে মনে করেন, তাঁদের তিনি একহাত নিয়ে বলেন, পুরুষ কঠোর বলে তাঁর বিজ্ঞানশিক্ষায় বাধা না থাকলেও, সাহিত্যপাঠে তো তাঁর বাধা থাকে না। যদি তাই হবে তাহলে নারীরও বিজ্ঞান পাঠ করা উচিত এবং প্রাবন্ধিক যে বিদেশী জ্ঞানের অধিকারী তার প্রমাণ পাই যখন দেখি তিনি ‘স্পেন্সার’-এর কথা উদ্ধৃত করেন এবং বলেন, “বিজ্ঞানই কাব্য”। তাঁর প্রবন্ধের প্রথম অংশে নারীর প্রতি যে মন্তব্য তা আমরা উনিশ শতকের সামাজিক প্রভাব হিসেবেই দেখতে পারি। সেই প্রভাব কাটানোর যথেষ্ট সময় পাওয়া নারীর প্রয়োজন ছিল, তা সত্ত্বেও উনিশ শতকেরই এক শিক্ষিত নারী যখন পুরুষের তৈরি করা নিয়মকে প্রশ্ন করছেন এবং যুক্তি দিয়ে নারীশিক্ষার পক্ষে কথা বলছেন, তাঁর কৃতিত্ব সেখানে অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। পত্রিকা সেই জায়গাটি অন্তত তৈরি করে দিতে পেরেছিল। উনিশ শতকের নারী নিজের হয়ে অবস্থান গ্রহণে ক্রমশ দক্ষ হয়ে উঠছিলেন।

অন্তঃপুরে এসে আমরা বাস্তব ছবির খানিকটা বদল দেখি। অন্তঃপুরে যে সকল মহিলা লিখছেন, তাঁরা কেউই নাম গোপন করছেন না। যেহেতু অন্তঃপুরের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল যে এটি কেবল মহিলাদের দ্বারাই লিখিত এবং পরিচালিত হবে, সেই কথাটিও এই পত্রিকা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। অন্তঃপুরে মহিলারাই লিখছেন এবং তাঁদের পরিচালনাতেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে বঙ্গমহিলা যেখানে শেষ করেছিল, অন্তঃপুর সেখানে থেমে

থাকেনি, বরং তার থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে তার যাত্রাপথ শুরু করেছিল। অন্তঃপুরের পাতায় প্রত্যেকটি লেখা এবং তার রচয়িতার নাম থেকে এই সিদ্ধান্তে আমরা আসতেই পারি।

অন্তঃপুরের প্রকাশিত বিষয়ের বৈচিত্র্যও অনেক বেশি ছিল। অন্তঃপুরে যেমন সমকালীন বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে লেখিকারা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করছিলেন, তেমনই মেয়েদের ইতিহাস, পুরাণ, বিদেশী ভাবধারার সঙ্গেও পরিচয় করানো হচ্ছিল। তেমনই নারী যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, সেইজন্য মেয়েদের ঘর সামলানো, শিশুর যত্ন নেওয়া, রান্না শেখার নানা খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। পারিবারিক মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, তাঁদের অল্প রোগে চিকিৎসা করার কিছু কিছু টোটকা শেখানোর বিষয়েও পত্রিকা সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকা থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে ছিল।

উনিশ শতকে বাঙালি নারীর নিজস্ব কোন জগৎ ছিল না একথা বলা যায় না। উনিশ শতকের নারীর জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাঁর ঈশ্বরভক্তি। যেমন আমরা রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি, তিনি পড়তে শিখেছিলেন, যাতে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। তাঁর ভক্তির নিদর্শন পাই তাঁর লেখায়,

ওহে প্রভু বিশ্বব্যাপী, বিশ্বময় বিশ্বরূপী
কতরূপে কত অবতার।
মহাদেবে কর মোহ, মোহিনী রূপেতে মোহ,
তব মায়া কে হইবে পার? [১]

এইরকম প্রচুর লেখা আমরা উনিশ শতক জুড়ে পাই। নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর মায়ের প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে বলেছিলেন, যেখানে মহিলারা প্রকাশ্যে চিৎকার করতে পারতেন না সেখানে তাঁরা ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন ও গোপন দুঃখের কথা বলে মন শান্ত করতেন।

১। রাসসুন্দরী, তদেব

একই কথা কেশব সেনের মা শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবী প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে। তাঁর বিয়ে হয় মাত্র দশ বছর বয়সে এবং এগারো বছর বয়সে তাঁর দীক্ষা হয়। তারপর থেকে সারাজীবন ধর্ম কর্মকেই তিনি জীবনের মূলমন্ত্র করে চলেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন না করলে মানুষের মুক্তি হয় না। প্রায় একই সুর আমরা কৈলাসবাসিনী দেবীর লেখাতেও পাই। এই ঈশ্বর ভক্তি যে উনিশ শতকের নারীর জীবনকে জড়িয়ে ছিল, তা আমরা বঙ্গমহিলার পাতায় , 'বামাগণের রচনাতেও পাই'। বেশ কিছু লেখাতে সেখানে ঈশ্বর প্রীতির নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। বিশেষ করে বঙ্গমহিলার প্রথম বছরের সংখ্যাগুলিতে।

যেমন প্রথম বর্ষের ৫ম সংখ্যায়, 'ঈশ্বর' নামের কবিতাটি। বলা হচ্ছে হরি নামের মাহাত্ম্যকীর্তন। হরির কাছে কবির আকুল আর্তি, তিনি যেন তাঁকে পথ দেখিয়ে মুক্ত করেন,

রুগ্ন মন হয়ে আছে, অজ্ঞান- বিকারে।
মোহ জাল কেটে হরি বাঁচাও আমারে।। [১]

এমনই কবিতার উদাহরণ আরও পাই। আলোচ্য বর্ষেরই প্রথম সংখ্যাতেই একটি কবিতা প্রকাশিত হচ্ছিল, "ঈশ্বরের প্রতি"। সেখানেও ভক্তির আধিক্য আমাদের নজর কাড়ে। জগৎপিতাকে স্মরণ করা হচ্ছে, সকল আঁধার দূর করার আশা করে।

কোথায় জগৎপিতা ডাকি হে কাতরে।
দেখা দাও দয়াময় এ দীন পামরে।

উনিশ শতকের মহিলারা শোক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বা না বলতে পারা কথা বলার জন্য ঈশ্বরের সাধনা করতেন কিনা তা প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু যে কারণেই হোক, উনিশ শতকের নারীর জীবনে ঈশ্বর ভক্তি যে অন্যতম কেন্দ্রীয় আচার ছিল, তা আমরা বলতেই

১। *বঙ্গমহিলা*, তদেব

পারি। তবে শুধু ঈশ্বর প্রীতি নয়, এই শতকের নারী প্রচুর ব্রত উদযাপন করেছে। এই ব্রত উদযাপন প্রসঙ্গে দীর্ঘ বর্ণনা পাই, প্রসন্নময়ী দেবীর লেখায়।

> শৈশবে আমরা সব বালিকা একত্র মিলিয়া কার্ত্তিক মাসে 'যমপুকুর' ও বৈশাখে 'পুণ্যপুকুর' পূজা ও 'নিত্যসুন্দরী' 'ফলদানের' ব্রত ইত্যাদি করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতাম।[১]

এছাড়াও মেয়েরা মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, অরণ্যষষ্ঠী, মূলা ষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী, শিবরাত্রি ইত্যাদি আরও নানাবিধ ব্রত পালন করতেন। ব্রতগুলিতে দেব-দেবীর মহিমাকীর্তন করা হলেও এগুলি সাংসারিক সুখের প্রার্থনা থেকেই করা হত। ব্রত গুলিতে ভালো স্বামী-সন্তান পাওয়ার আকাঙ্খা থাকত। এছাড়াও সতীত্বের কামনাও সেযুগের মেয়েদের বড় শ্রদ্ধার বিষয় ছিল। তাছাড়াও ছিল, স্বামীর মঙ্গলকামনা, ভাইএর মঙ্গলকামনা, পুত্র সন্তান কামনা ইত্যাদি আকাঙ্খা। যদিও আমাদের আলোচ্য পত্রিকাতে আমরা এই ব্রত পালনের মাহাত্ম্য প্রচার সেভাবে দেখি না। তাই আমরা সিদ্ধান্তে আসতেই পারি, পত্রিকায় যে সকল মহিলা লিখছেন, ঈশ্বর ভক্তি তাঁদের থাকলেও, পারিবারিক সুখের কথা তাঁরা ভাবলেও ব্রত পালন করে অন্ধভাবে সব দৈবের ওপর ছেড়ে দেওয়াতে হয়ত তাঁরা বিশ্বাস করেননি। শিক্ষার প্রথম কাজই মানুষের মনে যুক্তি বোধ জাগ্রত করা, উনিশ শতকের এই পর্যায়ে এসে মহিলারা যে অন্তত নিজেদের শিক্ষা দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরিবারের সেবা করতে চেয়েছেন, সেইটিই আশার কথা। পরিচারিকা, বামাবোধিনীর মত পত্রিকাগুলি যখন বারবার ধর্মযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার কাজে ব্রতী হচ্ছে, সেই সময়ে থেকেও বঙ্গমহিলা বা অন্তঃপুর কখনোই কেবলমাত্র ধর্ম যুক্ত শিক্ষা দিতে চায়নি। পূর্বের দুটি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, সেইকালে দাঁড়িয়েও পত্রিকা দুটি বারবার নিজেদের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। প্রাচীন-নবীনের বেশ কিছু দ্বন্দ, টানাপোড়েন আমরা পত্রিকা দুটির পাতায় দেখি, তা

১। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, তদেব

সত্ত্বেও পত্রিকা অনেক জায়গাতেই নিজেদের স্বাধীন মত প্রকাশ করছে। বঙ্গমহিলার থেকেও অন্তঃপুরের পাতায় এই সাহসী পদক্ষেপ অধিক পরিমাণে লক্ষ্যিত হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি, বঙ্গমহিলা একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনত পত্রিকা ছিল। মূলত বিদ্যালয়ের বালিকা বা গৃহবধূরা যাতে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারেন, সেই কথা ভেবেই পত্রিকাটির প্রকাশ। তাই পাঠ্য বিষয়ের লেখা এখানে অধিক সংখ্যায় থাকবে সেটি ছিল স্বাভাবিক। অন্যদিকে অন্তঃপুর ছিল স্বাধীন। সে কোনও প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র নয়, অন্দরের মহিলাদের নিজস্ব দুনিয়া তৈরি করা এবং তাঁকে শিক্ষিত করা এর উদ্দেশ্য হলেও পাঠ্য পুস্তকের বিষয় শেখানোর কোনও দায় এদের ছিল না। তাই হয়ত অন্তঃপুর তাঁদের বিষয়ে যত ভিন্নতা দেখাতে পেরেছে, তা বঙ্গমহিলার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার আর একটি কথাও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, বঙ্গমহিলা এবং অন্তঃপুর প্রকাশের মধ্যে বেশ খানিকটা সময়ের ব্যবধান ছিল। কালের নিয়মে এই সময় খুব বেশি না হলেও, উনিশ শতকের নারী যত দ্রুত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ক্রমে সমাজে নিজেদের পায়ের মাটি মজবুত করছিল, তাতে এই সময় নিঃসন্দেহে বড় ফারাক তৈরি করে দিয়েছিল। আর তার প্রমাণ আমরা দুটি পত্রিকার আলোচনা সূত্রে অনেকবার লক্ষ্য করেছি।

সেকালে মেয়েরা বিদ্যাচর্চা করে স্বাধীনভাবে ভাবনা চিন্তা করবে এই ধারণাটি উনিশ শতকের পুরুষ মেনে নিতে পারেনি কিন্তু পুরুষের এই ধারণার নিন্দে করতেও শিক্ষিত মহিলারা কুণ্ঠা বোধ করেননি। রাসসুন্দরী তো বলেইছেন, সেকালে সকলেই মহিলাদের বিদ্যা থেকে বঞ্চিত করেছেন, এই কাজটি যে তিনি ভালো চোখে দেখেননি, তা আমরা তাঁর আত্মজীবনী থেকেই জানতে পারি। আর একটি কথা যা রাসসুন্দরীর লেখা থেকে স্পষ্ট করা যায়, শুধু পুরুষ নয়, একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর থেকে মহিলারাও মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে

বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন। তাঁরা আসলে পুরুষের স্বরেই কথা বলতেন, সুতরাং মেয়েদের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে শুধু পুরুষরাই বাধা ছিলেন না, বাড়ির বয়স্থা মহিলারাও নারীর শিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন। শুধু রাসসুন্দরী নন, জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিকথা থেকেও আমরা জানতে পারি, সেই সময়ে মেয়েদের লেখাপড়াকে বাঙালি সমাজ ভালো নজরে দেখেনি।

কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি মানুষের অদম্য চাহিদা তৈরি হয়। এত প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও তাই রাসসুন্দরী নিজের বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করছেন। ধর্মগ্রন্থ পাঠের জন্য হলেও রাসসুন্দরীর এই জেদ নতুন সময়, আধুনিকতার সূচনা করে। উনিশ শতকের বাঙালি নারী মননে, চেতনে আধুনিক হয়ে উঠছিল। আর এই ঐতিহ্যই পরবর্তীতে বহন করে মহিলাদের জন্য প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলি। তাই বঙ্গমহিলা থেকে অন্তঃপুরের পাতায় বারবার বোঝানো হয় নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। এই শিক্ষা নিয়ে নারী কি করবে সে সম্পর্কে নানা মত থাকলেও শিক্ষা যে দরকারি, এই

ধারণাটি অন্তত উনিশ শতকের শেষে এসে বঙ্গনারীর হৃদয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের শেষ ভাগে এসে অন্তঃপুরের পাতাতেই, লীলাবতী মিত্র স্ত্রীশিক্ষাকে বাংলার উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত বলে মনে করছিলেন। তাঁর মতে,

> উচ্চশিক্ষার অভাবেই মেয়েদের মধ্যে হৃদয়ের ঔদার্য ও মহত্ত্বের বিকাশ বিঘ্নিত হইতেছে। [১]

উনিশ শতকের শেষে এসে এই সব রচনাগুলি পড়লে আমরা বুঝতে পারি, নারীসমাজ তাঁদের শিক্ষা নিয়ে গভীর ভাবনা চিন্তা করছিলেন। অন্তঃপুরের পাতাতেই বাসন্তীকুমারী দেবী দুঃখ করে বলেন,

---

১। *অন্তঃপুর*, তদেব

> ভারতবর্ষীয় পুরুষরা খুব ধর্মপ্রাণ এবং শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; কিন্তু শাস্ত্রে যে কন্যাদের পুত্রের সমান যত্ন নিয়ে শিক্ষা দানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, পুরুষরা তার প্রতি কর্ণপাত করেন না। [১]

আমরা দেখি এই বাক্যে দুঃখের থেকেও বেশি অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। পুরুষরা যে নারীকে বিদ্যা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, এই সার কথাটি উনিশ শতকের নারী বুঝতে পেরেছেন, আর শুধু নিজে বুঝেই থেমে থাকেননি, পত্রিকার পাতায় মুক্ত হস্তে তা প্রকাশ করে অন্যান্য মহিলাদেরও এই সত্যিটি বোঝাতে উদ্যোগী হয়েছে। এমন কথা প্রকাশ করার জন্য পত্রিকাটিকে বাহবা দিতেই হয়। শুধু তাই নয়, গোটা সমাজের সাপেক্ষে অতি কম হলেও, বেশ কিছু মহিলার নিজস্ব জগতের অন্যতম গুরুত্ব উপাদান হিসেবে শিক্ষা প্রবেশ করছিল। উনিশের শুরুতে মেয়েরা যেখানে অবস্থান করছিল, উনিশের শেষে এসে সেই জায়গারই এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। কতজন মহিলা উচ্চশিক্ষা পেলেন, কতজন বালিকা বিদ্যালয়ে যেতে পারল, এই পরিসংখ্যানের থেকেও এই যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল, মানসিকতার বদল, তা অনেক বেশি আধুনিকতার সূচনা ঘটিয়েছিল। একুশ শতকে আজকে মহিলাদের যে অবস্থান, তাঁর সলতে পাকানোর শুরু যে উনিশ শতকের এই শেষের দুটি দশক থেকেই, তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

বঙ্গমহিলা প্রকাশিত হচ্ছে, ভুবনমোহন সরকারের অধ্যক্ষ সমিতি থেকে। তাছাড়াও এটি একটি বিদ্যালয়ের মুখপত্র, সেই হিসেবে এই পত্রিকায় বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। অন্তঃপুর যে সাহসের সঙ্গে নারীর ঋতুচক্র নিয়ে বা সূতিকা গৃহ নিয়ে আলোচনা করতে পারছে, সেইরকম বিষয়ের অবতারণা বঙ্গমহিলার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই নারীর আঁতের কথা বলতে অন্তঃপুর যতটা সমর্থ হয়েছিল, বঙ্গমহিলা সেখানে বেশ খানিকটা

১। ঐ

পিছিয়েই থেকেছে। অন্যদিকে পুরুষ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কারণে বেশ কিছু স্থানে বঙ্গমহিলা নারীর যথার্থ মন, তার অবস্থান বুঝতে অসফল হয়েছে। অন্যদিকে অন্তঃপুরের চালিকা শক্তি মহিলাদের হাতে থাকায় তাঁরা নারীর গোপন ব্যথার জায়গাটি অনেকাংশে বেশি মাত্রায় বুঝতে সক্ষম ছিলেন। অন্তঃপুরের সম্পাদক যে তিনজন মহিলা তাঁরাও সেই সময়ের নিরিখে ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। তাই মহিলারা শিক্ষিত হলে কি হয়, তার শিক্ষার উপযোগিতা তাঁরা যেভাবে বলতে পেরেছেন, বঙ্গমহিলার পক্ষে তা নিতান্তই অসম্ভব ছিল। অন্তঃপুর পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেছেন, বনলতা দেবী, কুমুদিনী মিত্র, হেমন্তকুমারী চৌধুরী। এঁদের মধ্যে হেমন্তকুমারী চৌধুরীর কথা আমরা আলাদা করে বলব।

হেমন্তকুমারী চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৫০), অন্তঃপুরের সম্পাদনা করেন, ১৯০১ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন উত্তরপূর্ব ভারতের প্রথম মহিলা সম্পাদক। এরও প্রায় তেরো বছর আগে ১৮৮৮ থেকে তিন বছর ধরে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে হিন্দী সাময়িকী 'সুগৃহিণী' সম্পাদনা করেছেন। ইতিহাস অনুযায়ী তিনি ছিলেন হিন্দি সাময়িকপত্র জগতের প্রথম মহিলা সম্পাদক।

> ইস পত্রিকা ['সুগৃহিণী']-কে সম্পাদক হোনে কে নাতে শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী কো ভারত কী প্রথম হিন্দী [মহিলা] পত্রকার এবং সম্পাদক হোনে কী গৌরব প্রাপ্ত হ্যয়। [১]

সুতরাং বাংলা সাময়িক পত্রের জগতে এমন শিক্ষিতা মহিলা যে নতুন পথের সন্ধান দেবেন তা তো বলাই বাহুল্য। আর তাই তাঁর সম্পাদনায় অন্তঃপুর নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। অন্তঃপুরের বিভিন্ন সংখ্যায় তিনি লিখেছেন, 'ইংলণ্ডের রাজলক্ষী ও ভারত সাম্রাজ্ঞী', 'জাতীয় মহাসমিতি', 'পারস্য জাতি', 'সামাজিক ছোট কথা' প্রভৃতি নানা রকমের বিষয়। নারীজাতির সামনে সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন, তা তৎকালীন গৃহবন্দী

১। ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য , *স্মরি বিস্ময়ে,* কলকাতা : সিগনেট প্রেস, অক্টোবর ২০১৮

নারীর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল, আর সেখানেই তাঁর সার্থকতা। তাই বঙ্গমহিলার সীমিত পরিসর ডিঙ্গিয়ে অন্তঃপুরের সম্ভার নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের সাতের দশকে বঙ্গমহিলা যে জায়গা থেকে চলা শুরু করেছিল, উনিশ শতকের শেষে এসে অন্তঃপুর সেই পথের অনেকাংশেই সংস্কার করে ফেলেছিল। শিক্ষা, ঘর-গৃহস্থালি, পরিবার সবেতেই অন্তঃপুর অগ্রগতির প্রকাশ দেখিয়েছিল। তা সত্ত্বেও যেটুকু রক্ষণশীলতা আমরা পাই, তা সমকালের প্রভাব। সেযুগের নব্য-শিক্ষিত বাঙালি পুরুষও এই রক্ষণশীলতা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই একে আমরা আলাদা করে কোনও দোষ হিসেবে না দেখে সেই সময়ের সামাজিক প্রবণতা হিসেবেই ব্যাখ্যা করব। উনিশ শতকের নারীর চেতনা মুক্তির যে প্রয়াস পত্রিকা দুটি দেখিয়েছিল, তা এক কথায় সেই যুগের পক্ষে এক বিপ্লব বলা চলে।

এতকিছুর পরেও যে কথাটি আমাদের ভাবায়, এই পত্রিকায় যে নারীদের ছবি আমরা পাই, তাঁরা সবাই ধর্মের নিরিখে হিন্দু বাঙালি নারী। মুসলমান বাঙালি নারীর শিক্ষা, তাঁদের স্বর কিন্তু এই দুটি পত্রিকা তুলে ধরতে অসমর্থ। উনিশ শতকের পুরুষের আধুনিক শিক্ষা এবং অগ্রগতির ইতিহাসেও আমরা একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুসলমান বাঙালি পুরুষের স্বর পাইনি। ১৮৩০ সালে ঢাকা শহরে যে জনগণনা হয় তাতে, মুসলমানের সংখ্যা ৩২,২৩৮ এবং হিন্দুর সংখ্যা ৩১,৪২৯, অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান।[১129] মোটামুটিভাবে এই অনুপাত আমরা বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই খানিকটা যদি একই ধরি, তাহলেও দেখব, উনিশ শতকের শুরুতে স্থাপিত 'হিন্দু কলেজ' বা পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত 'হিন্দু মেলা'-তে আলাদা করে

১। হোসেনুর রহমান, *উনিশ শতকে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক,* অলোক রায় , গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাংলা,* কলকাতা : পারুল, ২০১৩, ৩৩৯

দেগে দেওয়া ‘হিন্দু’ নামটি আমাদের কানে বাজে। যদিও নামে উল্লেখ না থাকলেও সেকালের ‘সংস্কৃত কলেজে’ কোন মুসলমান ছাত্রের পড়ার অধিকার ছিল না। অবশ্য হিন্দুদের স্কুল-কলেজেও যে সব শ্রেণীর হিন্দু ছাত্র পড়ার সুযোগ পেত, এমন ভাবারও কোন কারণ নেই। কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দু পুরুষই এই সুবিধালাভের অধিকারী ছিল। হিন্দু অনেক আগের থেকেই আধুনিকের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে। সেই সাপেক্ষে মুসলমান বাঙালি বেশ খানিকটা পিছিয়েই ছিল। তবু একথাও অস্বীকার করা যায় না, শিক্ষিত হিন্দু সমাজ কোনোদিনই মুসলমানের অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন ছিল না। আর তাই দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করেও তাঁদের জল-চল হয়নি। মুসলমান তাঁদের কাছে বরাবর ‘পর’ হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে। মুসলমান সমাজের অগ্রগতি থমকে যাওয়ার পিছনে ঐতিহাসিকরা যে মত টিকে অধিক প্রাধান্য দেন, তা হল ভাষার পরিবর্তন। ব্রিটিশ শাসনের আগের সময়ে সরকারী ভাষা ছিল ফারসি। উনিশ শতকের থেকে ফারসির জায়গা ধীরে ধীরে দখল করে নিল ইংরাজি ভাষা, এবং ছাপাখানা ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দৌলতে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার কদর বৃদ্ধি পেতে লাগল। আর এই সুযোগের সুবিধা নিল নতুন তৈরি হওয়া শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণী। মুসলমান নীচু তলার মানুষেরা প্রথম থেকেই এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল, আর উচ্চবর্ণের মুসলমান সমাজ প্রথমে এই আধিপত্যকে স্বীকার করেননি। ফলে কালের বিচারে তাঁরা কিছুটা হলেও আধুনিকতা থেকে পিছিয়ে গেছেন। মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও তৈরি হয়েছে বেশ কিছু সময় পর। সুতরাং আধুনিকতার জায়গায় এই বিভেদ নিঃসন্দেহে একটি সাংস্কৃতিক বাধা তৈরি করে দিয়েছিল। অনুরূপ চিত্র পাই, যখন দেখি মহিলাদের শিক্ষা নিয়েও উনিশ শতকে যত কথা, তর্ক হয়েছে, তা হয়েছে, হিন্দু মহিলাদের নিয়ে। মুসলমান নারী সমাজের বিবরণ সেখানে প্রায় নেই বললেই চলে। এমনকি বঙ্গমহিলা বা অন্তঃপুরের

পাতাতেও যেসকল মহিলারা লিখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ধর্ম পরিচয়ে হিন্দু। তাঁদের ধর্ম, পূজাপার্বণ, ব্রত ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে মুসলমান সমাজের কোনও ছবি নেই। একই সমাজে পাশাপাশি ওপর একটি ধর্ম, সংস্কৃতি অথচ তাঁদের কোনও হদিশ পত্রিকা দুটি দেয় না। ফ্রেমের বাইরে যারা থাকল, তাদেরও ইতিহাস আছে, ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই আছে, সেই লড়াইয়ের চিত্র আমরা পাই না বলেও তাদের ভাবনাকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া যায় না। তাঁরা কোন সাহিত্যে, কিভাবে নিজেদের পাচ্ছিলেন এই প্রশ্নটি থেকেই যায়। তাঁদের কোনও সাহিত্য ছিল না, লড়াই ছিল না-এ কি হতে পারে? উনিশ শতকের প্রথম সারীর সাহিত্যতেও মুসলমান বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রে আসেনি। যখন এসেছে তাও বিপরীতে। ‘পর’ হিসেবে। উনিশ শতকের এই মেয়েদের পত্রিকা যাঁদের কথা ভেবে প্রকাশিত হচ্ছে, তাঁরা একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত, রুচিবোধসম্পন্ন বাঙালি পাঠিকার ধর্ম পরিচয়ে হিন্দু হওয়াও আসলে তার পাঠিকা হওয়ার যোগ্যতা নির্বাচন করছে, আলোচ্য পত্রিকার বিভাগ গুলি থেকে এই ধারনাটিই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। একটি বড় সম্প্রদায়ের মহিলার কথা সেখানে অনুপস্থিত। তাই যেখানে তাঁদের সাহিত্য নেই, স্বর নেই, সেখানে গোটা ছবি নেই। তাই টুকরো টুকরো তথ্যে কোলাজ বানানো ছাড়া আমাদের গতি নেই। এক্ষেত্রে পত্রিকা দুটিও যে ভীষণভাবে ব্যর্থ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এতক্ষণ আলোচনায় আমরা দেখলাম উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে বঙ্গমহিলা ও অন্তঃপুর ভাল-খারাপের মিশেলে এক নতুন নারী নির্মাণের চেষ্টা চালিয়েছে। বঙ্গমহিলা থেকে অন্তঃপুর পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা ক্রমশ উন্নতির পথেই এগিয়েছে। উনিশের শেষ এবং বিশের শুরুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে বঙ্গমহিলাকে ছাপিয়ে অন্তঃপুর নিজের অগ্রগতি এবং ক্রম পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিকতাকে চেতনায় প্রবেশ করাতে অনেকখানিই সক্ষম

হয়েছে। কিন্তু চারটি অধ্যায় আলোচনার পরে যে প্রশ্নটি আমাদের স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে, তা হল, একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আমরা উনিশ শতকের দুটি পত্রিকা নিয়ে কেন আলোচনা করব বা বঙ্গমহিলা এবং অন্তঃপুরকে এখন আমরা কেন পড়ব? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমরা এই সময়ের কয়েকটি মেয়েদের পত্রিকার পাতায় একটু নজর দেব।

'মেয়েদের পত্রিকা' বিষয়টি বর্তমানে আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। 'মেয়েদের পত্রিকা' কথাটি বলামাত্রই আমরা সেই সকল পত্রিকার কথা বলছি, যাদের 'Target Group' মেয়েরা। সহজভাবে বললে, মেয়েদের পত্রিকা তাই-ই, যা আসলে মেয়েদের উদ্দেশ্য করে, মেয়েদের জন্য লেখা হয়। কিন্তু এত সহজে কি বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটে? আমরা তো জানি যে কোনো মানুষের পরিচয়ের একক একটিমাত্র নয়। 'মেয়েরা' বলতে আমরা কোন মেয়েদের কথা বুঝি? আমাদের বাড়িতে যে দিদি/ মাসি/ পিসি – যাঁরা রোজ এসে কাজ করেন বা রাস্তায়- ঘাটে যে সকল মহিলারা রোজ ভিক্ষা করেন, তাঁরাও কি এই 'মেয়ে'দের তালিকাভুক্ত? স্পষ্টভাবে বললে, উত্তরটি যে না হবে তা তো বলাই বাহুল্য। মেয়েদের পত্রিকার উপভোক্তা হওয়ার জন্য সবার আগে প্রয়োজন অক্ষর পরিচয়। অর্থাৎ, প্রথম শর্ত, সাক্ষর হতে হবে, অক্ষর পরিচিতি থাকলে তবেই সে এর উপভোক্তা হতে পারবে। কিন্তু এখানেই পরের প্রশ্নটি আসে, শুধু অক্ষর পরিচিতি থাকলেই কি এই সকল পত্রিকার 'পাঠিকা' হওয়া সম্ভব? এই পত্রিকার নাগাল পেতে হলে উপযুক্ত অর্থ, শিক্ষা, রুচি এবং অবশ্যই বিলাসিতার জন্য প্রয়োজনীয় অবসর প্রয়োজন। তবেই এই পত্রিকার পাঠিকা হওয়া সম্ভব। সুতরাং এই পত্রিকার পাঠিকা হওয়ার জন্য আবশ্যক তিনটি শর্ত আমরা পেলাম। প্রথমত, শিক্ষিত হতে হবে; দ্বিতীয়ত, আর্থিক সঙ্গতি থাকতে হবে এবং এরই সঙ্গে অবধারিতভাবে আসবে তৃতীয় শর্ত, কাজের বইয়ের বাইরে বই কিনে পড়ার বিশেষ সংস্কৃতি ও রুচিবোধ থাকতে হবে।

শুধুমাত্র তিনটি শর্তের সাপেক্ষেই বলা যায়, এই বিশেষ পত্রিকাগুলির উপভোক্তা একটি বিশেষ শ্রেণীর মেয়েরা। সুতরাং বলতেই পারি, 'মেয়েদের পত্রিকা' নাম হলেও তা আসলে প্রকাশিত হয় বিশেষ কিছু মহিলাদের কথা মাথায় রেখে। এই প্রসঙ্গে আমরা দুএকটি উদাহরণ দেখাতে পারি, এই সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি মেয়েদের পত্রিকার পাতার থেকে।

> জন্মসূত্রে পাওয়া চেহারা সবসময় নিখুঁত হয় না সবার। এ নিয়ে মনের মধ্যে খুঁতখুঁতানি থাকেই। পুজো্র সময় দারুণ ফ্যাশন, দুরন্ত স্টাইল, অপরূপ সাজগোজ যাই করা হোক না কেন, মনের সেই খুঁতখুঁতানি বা আফসোস থেকেই যায়। এবার পুজোয় তাই আগে থাকতেই করে নিতে পারেন কারেকশনাল থেরাপি। আধুনিক কসমেটোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টে সারিয়ে নিতে পারেন নির্দিষ্ট খুঁতটুকুনি।[১]

কিম্বা,

> একটা ক্লিকেই এখন দুনিয়া হাজির চোখের সামনে। প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, সিডনি, দুবাই, মরিশাস, হংকং, ব্যাঙ্কক, রোম থেকে শুরু করে ঘরের পাশে দীঘা, দার্জিলিং, পুরী, মুকুট মণিপুর, পেলিং যেখানে যেতে চান .....।[২]

একই বছরের(২০১৪) দুটি পত্রিকা, 'অদ্বিতীয়া' এবং 'সুখী গৃহকোণ'। দুটি পত্রিকার সম্পাদকই পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে লিখছেন। এমন পাঠিকা যাদের এমন খরচসাপেক্ষ বিলাসিতা করার অর্থ এবং সময় দুই-ই আছে। এই শ্রেণীর মহিলাদের জন্যই পত্রিকাগুলি মাসে একবার বা দুবার করে প্রকাশিত হয়। সংখ্যার বিচারে এঁরা সামান্য হলেও ক্ষমতার নিরিখে তো এঁরাই শীর্ষে। উনিশ শতকেও বঙ্গমহিলা বা অন্তঃপুর যাঁদের উদ্দেশ্য করছিল, তাঁরাও সমাজের

১। অদ্বিতীয়া, ২০১৪

২। ঐ

অগ্রসর শ্রেণী। সব শ্রেণী, সব বর্ণের মহিলারা তো সেখানে স্থান পাননি। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে বিষয়টি ভালোই সংযোগ তৈরি করে।

বর্তমানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই মেয়েদের পত্রিকায় যে ফিচার গুলি দেখি তা আমাদের উনিশ শতকের অন্তঃপুরের পাতার কথা মনে পড়ায়। যেমন, ঘর গোছানো, স্বামী-সংসার-সন্তান প্রতিপালন, শরীরচর্চা, রূপচর্চা, রান্না, পোশাক ইত্যাদি। আমরা অবাক হয়ে যাই অন্তঃপুরের পাতার সঙ্গে এমন হুবহু মিল দেখে। কি বলে এই আধুনিক পত্রিকাগুলি?

ঘর গোছানোর অংশে থাকে, বাড়িতে অতিথি এলে কেমন আয়োজন করতে হবে, পোকামাকড়ের হাত থেকে ঘর, জামাকাপড় রক্ষা করার টিপস, ঘর সুন্দর করে গুছিয়ে রাখার কৌশল, এরই সঙ্গে থাকে, কর্মক্ষেত্র ও সংসার একই সঙ্গে 'ম্যানেজ' করার উপদেশ, স্বামী-শ্বশুরবাড়ির দেখাশোনা, সন্তানকে পড়ানোর গাইডলাইন, তারই সঙ্গে বিভিন্ন বাহারী রান্নার প্রণালী। এই অংশ গুলি পড়ে আর একটি বিষয়ের কথা আমাদের মাথায় আসে, তা হল, এখনকার বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাত্র-পাত্রীর বিয়ের সন্ধানের বিজ্ঞাপনগুলির কথা। সেখানে বলা থাকে , ফর্সা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, শান্ত স্বভাবের, ঘরোয়া, [কখনো বা কর্মরতা, তবে কর্মরতা হলেও গৃহকর্মে নিপুণ হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত।], এমন পাত্রী চাই। সুতরাং একুশ শতকে দাঁড়িয়েও পুরুষের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর যে গুণগুলি আশা করে, তা উনিশ শতকের শিক্ষিত পুরুষেরও কাম্য ছিল। তাহলে আমরা এগোলাম কতখানি? এই পত্রিকাগুলি তো নেপথ্যে থেকে সমাজে এমন নারী, যে আদর্শ বউ হবে, তৈরি করার কাজেই এখনো ব্রতী। পত্রিকাগুলি লিখছে, 'বিয়ের আগেই রূপ সমস্যার সহজ সমাধান' , যেন এই সময়েও মেয়ের রূপ বিচার করবে তার বাড়ির বউ হওয়ার যোগ্যতা। বিয়ের আগে সুন্দর দেখতে লাগা, বিয়ের পর স্বামীর জন্য টিফিন বানানো, সবই মেয়েদের হাতে। তাহলে কি আমরা বলতে পারি, এই পত্রিকাগুলি আসলে পাত্র –পাত্রী বিজ্ঞাপনের চাহিদা অনুযায়ী আদর্শ

স্ত্রী তৈরি করার দায় নিচ্ছে, ঠিক যেমন উনিশ শতকের মহিলাদের পত্রিকাগুলি আদর্শ নারী চরিত্র নির্মাণের গুরুভার নিজেরা নিয়েছিল। তাহলে আমরা উনিশ শতকের নারীর অবস্থানের তুলনায় একুশ শতকের নারীরা কোন স্থানে রয়েছি?

আর একটি বিষয় যা আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়, 'সুখী গৃহকোণ' (২০১৪) এর জুলাই মাসের 'অন্দরসজ্জা' নামক বিভাগটি। এখানে বলা হচ্ছে, ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্ক মহিলাদের বাড়ির রান্নাঘরটিকে মনের মত করে সাজানোর জন্য লোন দিচ্ছে। উনিশ শতকের পত্রিকা দুটির পাতায়, কিম্বা সামাজিক পরিসরে মহিলাদের জন্য রান্না এবং রান্নাঘরটি কতখানি গুরুত্বের ছিল তা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে এসে আমরা অবাক হই, তাহলে কি মহিলা = রান্নাঘরের দায়িত্ব এই কথাটি একুশ শতকেও সমানভাবে প্রযোজ্য? মহিলা যতই শিক্ষিত হোক, যতই বাইরে যাক, এইসকল চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থার পরিবর্তন কি কোনোদিন হবে না? তাহলে আমরা উনিশ শতককে পুরনো, প্রাচীন, বিগত বলে দূরে সরিয়ে রাখব কোন যুক্তিতে? কালের নিয়মে আমরা আধুনিক থেকে অতি আধুনিকে এসেছি, আমাদের শিক্ষা, সমাজে অধিকারের কিছু রদবদল ঘটেছে ঠিকই, আমাদের পোশাকও বদলেছে,কিন্তু মন? তা কি সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পেরেছে? উনিশ শতকের পিছুটান কি একুশ শতকের নারীরা এখনো বহন করে চলেছে না? সুতরাং এই বিষয়গুলি মাথায় রাখলে উনিশ শতকের পত্রিকা দুটি এখনো সমান প্রাসঙ্গিক। আমরা এখনো উনিশ শতকের পত্রিকার সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে পারি, এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে পারি। আমাদের উপলব্ধির প্রয়োজন উনিশ শতকের নারীর পায়ের শিকল একুশ শতকে এসেও ছেঁড়েনি, তা কেবল খানিকটা বড় হয়েছে, আর এখানেই উনিশ শতকের মেয়েদের পত্রিকার প্রাসঙ্গিকতা।

উপসংহার

বঙ্গমহিলা এবং অন্তঃপুর এই দুটি পত্রিকা নিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্য ছিল, ১৮৭৫ সাল থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত বাংলার নারীপ্রগতির ধারাটিকে বুঝতে চাওয়া। আলোচ্য চারটি অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, পত্রিকা দুটি উনিশ শতকের নারীশিক্ষা, নারীর মুক্তির মত বিষয়গুলি নিয়ে কোন অবস্থান গ্রহণ করছে। বঙ্গমহিলা ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হচ্ছে, বিদ্যালয়ের বালিকাদের এবং বাড়ির মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে, ফলে এর বিষয় বৈচিত্র্য কম। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই পত্রিকা সমসাময়িক নানা বিধি নিষেধের দ্বারাও প্রভাবিত।

অন্যদিকে অন্তঃপুর পত্রিকা স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তাই তার বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা আছে। এই পত্রিকাও মহিলাদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই মূলত প্রকাশিত হলেও এঁরা কখনোই মহিলাদের প্রথাগত শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। বরং সামগ্রিক ভাবে নারীসমাজের উন্নতি সাধনের জন্য মহিলাদের সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ করার প্রয়াস চালিয়েছে।

১৮৭৫ সাল থেকে ১৯০৩ সময়ের দিক থেকে মাত্র ২৮ বছর হলেও, বাঙালি নারীর জীবনে এই কাল পর্বটি বিশেষ অগ্রসরতার সাক্ষ্য বহন করে। নারীশিক্ষা প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উনিশ শতকের মানুষ একে সহজভাবে মেনে নেয়নি। নারীকে কেন্দ্রে রেখে যখন উনিশ শতকে একের পর এক সংস্কার আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তখনও একদল রক্ষণশীল মানুষ প্রাণপণে এর বিরোধিতা করে গেছেন। বিদ্যাচর্চা নারীর কাজ নয়, পড়াশোনা করলে নারী বিধবা হয়, বন্ধ্যা হয়। অতিরিক্ত কঠিন বিদ্যাচর্চা নারীর নারীত্ব হরণ করে। নারী হঠাৎ কেন বিদ্যাশিক্ষা করবে, তাকে যখন ঘরই সামলাতে হবে, সন্তান প্রসব করতে হবে, তখন বিদ্যাচর্চা

করে সে কি করবে এই সকল প্রশ্নে উনিশ শতকের মানুষ প্রচুর আলাপ-আলোচনা করেছে। এই বিরোধী মানুষের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। ধীরে ধীরে যখন নারীশিক্ষার বিষয়ে সমর্থকদের জয় হচ্ছে, তখনও প্রশ্ন উঠেছে, নারী কি শিখবে, কতখানি শিখবে। যখনই কি শিখবে কথাটি বলা হয়, একইসঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় কি শিখবে না এই বিষয়টিও। উনিশ শতকের নারীর লেখাপড়া করার কাজটি সহজে হয়নি। মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর ক্ষেত্রে সেই সময়ে বেশিরভাগ মানুষই রাজি ছিলেন না। আর মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত খুবই কম বয়সে তাই সেই সময়ে বাড়ির বউয়ের প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। নারী একইসঙ্গে পুরুষের পাশে বসে পড়াশোনা করবে উনিশ শতকের মানুষের কাছে এটি কল্পনারও অতীত ছিল, তাই একের পর এক মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও তাতে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মত কম।

তাই এই বিষয়টি মাথায় রেখেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রকাশিত হয় একের পর এক মহিলাদের পত্রিকা। এঁরা মহিলাদের বাড়িতে বসেই শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিল। এই একই উদ্দেশ্য নিয়েই বঙ্গমহিলা এবং অন্তঃপুর প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৫ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত নারীর শিক্ষা, সচেতনতা নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই সময়ের মধ্যে নারীর নিজস্ব স্বর তৈরি হয়। হতে পারে তা সবসময় আধুনিক পরিপন্থী ছিল না, অনেকসময়েই পুরুষের রক্ষণশীলতা তাকে গ্রাস করেছে, কিন্তু তারপরেও সে অন্তত নিজের হয়ে কলমটুকু ধরতে পারছিল। বঙ্গমহিলায় প্রকাশিত মহিলাদের রচনার সঙ্গে অন্তঃপুরের পাতায় প্রকাশিত মহিলাদের রচনার একটা বড় পার্থক্য দেখা যায়, তা নারীর ক্রমবিকাশের কথা বলে। সব পিছুটান না কাটিয়ে উঠতে পারলেও নারী তার শিক্ষার অধিকার

আছে, আলাদা মানুষ হিসেবে নিজেকে গণ্য করার অধিকার আছে, এই সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিল। বঙ্গমহিলার গ্লানি, কুণ্ঠা, অন্তঃপুরে এসে পরিণত হল সাবলীলতায়। বঙ্গমহিলার যে নারী তখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি, বা সবে তার নিজের হয়ে কলম ধরা শুরু করেছে, অন্তঃপুরে এসে সেই নারী অনেক অকপট। সে আর কুণ্ঠিত নয়। সমাজের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত আছে। তার কলম, আত্মবিশ্বাস এই সময়ে অনেক মজবুত। আর নারীর উত্তরণের এই সোপানটিই প্রস্তুত করে দিয়েছিল, বঙ্গমহিলা, অন্তঃপুরের মত মাসিক পত্রিকা। নারী কি শিখল এই প্রশ্নের থেকেও গুরুত্ব পায়, নারী শিখল। ১৮৭৫-১৯০৩, উনিশ শতকের এই তিনটি দশকে নারী শিক্ষা, নারীর চরিত্র নির্মাণের খোলনলচেই বদলে দিয়েছিল আমাদের আলোচ্য পত্রিকা দুটি। সমাজে নারীকে যেভাবে দেখতে চাওয়া হচ্ছিল, তার আদলে নারীকে গড়ার চেষ্টা করলেও নারীর মানসিকতার যে বিপুল পরিবর্তন তাঁরা ঘটিয়েছিল, তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তাঁদের দেখানো পথ ধরেই আজও মহিলাদের পত্রিকার পাতায় আমরা একই সুর লক্ষ্য করতে পারি। আর তাই উনিশ শতকের নারী প্রগতি এবং নারী চরিত্র নির্মাণের ধারাটিকে বুঝতে হলে এই সময়ে দাঁড়িয়েও বঙ্গমহিলা এবং অন্তঃপুরের মত পত্রিকার অবদান এক কথায় মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না।

সুতরাং চারটি অধ্যায়ের পর আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, উনিশ শতকের মানুষ নারীশিক্ষা নিয়ে যতই বিরোধিতা করুক, কালের নিয়মে নারী সমাজের শিক্ষা এবং সর্বোপরি তাঁদের আধুনিকে আগমন সেই সময়ের পক্ষে ছিল অনিবার্য। তাই নিয়ম মেনেই আধুনিকারা ক্রমশ অশিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করেছে। কিন্তু নারী শিক্ষা পেলে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হবে, চাইবে স্বাধীনতা, ফলে এতদিনের ভারতীয় সমাজের যে

পরিবার প্রকল্প তা ভেঙে পড়ার ভয়ে ভীত হয়ে নারীর শিক্ষা তার প্রগতিকে স্বল্প পরিসরে আটকে রাখার প্রচেষ্টা চলেছে। বিষয়টি এত সরলরেখায় না এগোলেও উনিশ শতকের নারীর শিক্ষাকে নির্দিষ্ট করে রাখা যে আসলে পরিবার বাঁচানোর অন্যতম লড়াই এর সাক্ষ্য বহন করে তা বুঝতে আমাদের আর কোন অসুবিধে থাকে না। আর এই প্রকল্পে সচেতন ভাবে হোক বা অসচেতন ভাবেই মহিলাদের পত্রিকা অংশগ্রহণ করেছে। তাঁরা চেষ্টা করেছেন, আদর্শ স্ত্রী বানানোর। ১৮৭৫ থেকে ১৯০৩ এই কাল পর্বে বঙ্গমহিলা বা অন্তঃপুর ও এই প্রকল্পে অংশ নিয়েছে। আমরা জানি সমাজের বাস্তবতার প্রতিফলন পাওয়া যায় সাহিত্যে। তাই এই সময়ের বাস্তব ছবিটিও পত্রিকা দুটির মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। সমকালীন পত্রিকা থেকে কখনো ভিন্ন, কখনো এক মত পোষণ করলেও বস্তুতপক্ষে অজান্তেই পত্রিকা দুটি এই সময়ের নারী প্রগতির ইতিহাসকে চিত্রিত করেছে। সমকালীন সময়ের সাপেক্ষে তাই আলাদা মনে না হলেও পরবর্তী নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের রসদ প্রস্তুত করে নারীকে উনিশ শতকের থেকে বিশ শতকের দুনিয়ায় নিয়ে গেছে। তাই এই সময়ের নারী চরিত্র নির্মাণের ধারাটি আমাদের কাছে বহুমাত্রিক রূপে প্রতিভাত হয়। আর এখানেই পত্রিকা দুটির কৃতিত্ব।

উনিশ শতকে নারীশিক্ষা এবং নারীচরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আলোচ্য পত্রিকা দুটি বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছিল। পরবর্তী নারীস্বাধীনতা বিষয়ক যত আন্দোলনই হোক না কেন, আমাদের আলোচিত পত্রিকা দুটি সেই ক্ষেত্রেও দাঁড়িয়ে থাকবে ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে।

পরিশিষ্ট

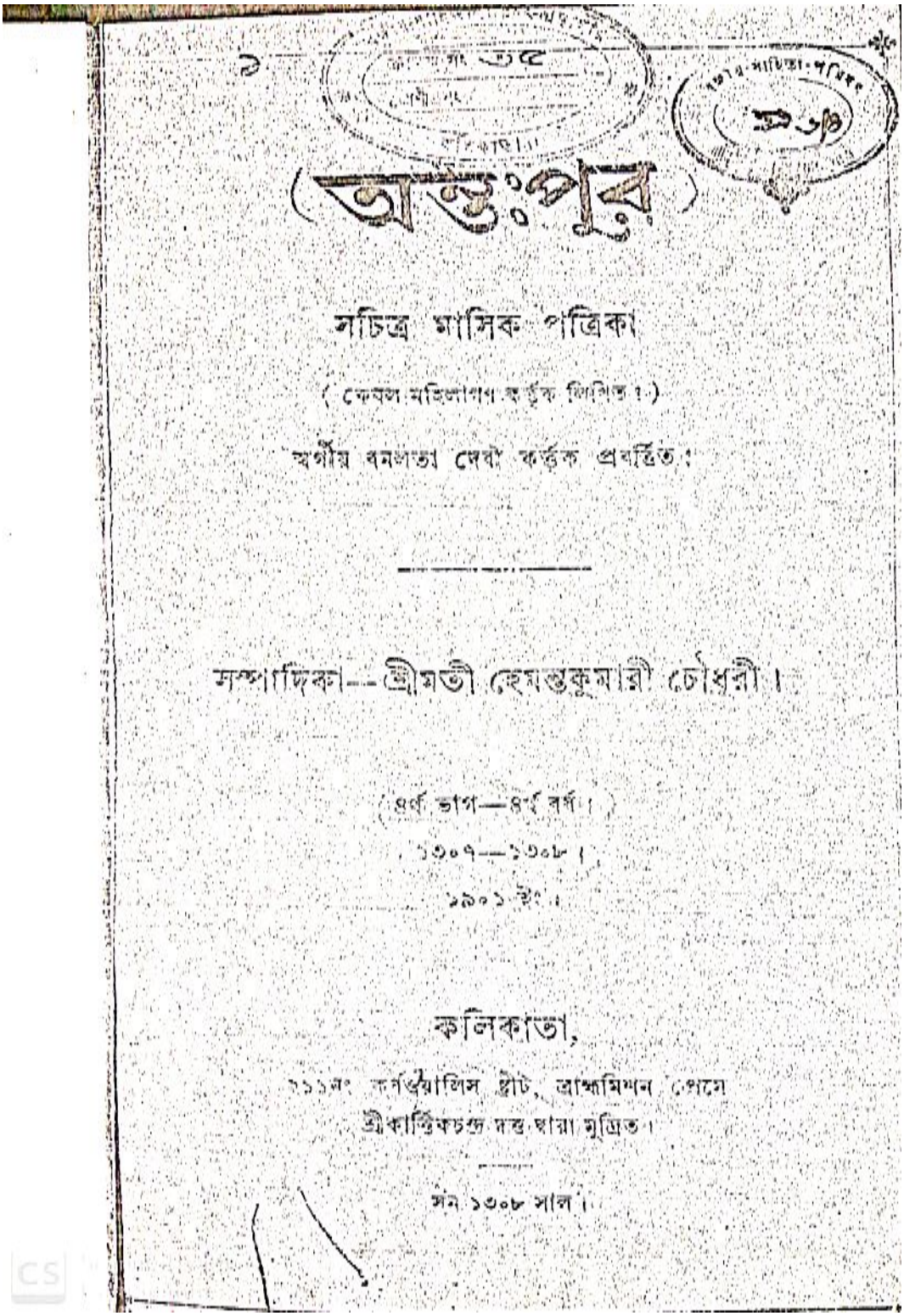

অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

(কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত।)

স্বর্গীয় বনলতা দেবী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

সম্পাদিকা—শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী।

(৪র্থ ভাগ—৪র্থ বর্ষ।)

১৩০৭—১৩০৮।

১৯০১ ইং।

কলিকাতা,

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল।

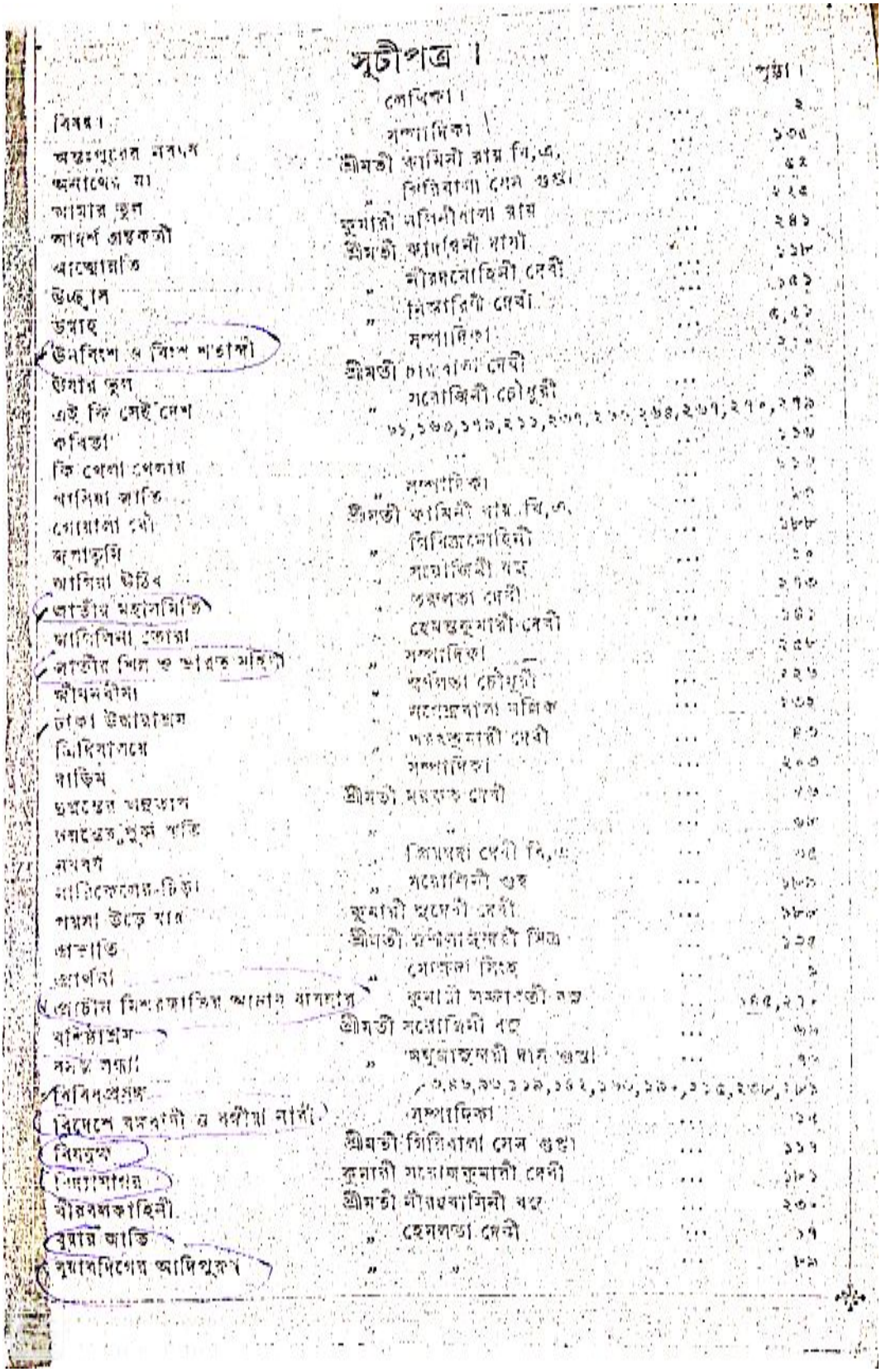

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	লেখিকা ।	পৃষ্ঠা ।
		২
অন্তঃপুরের নবযুগ	সম্পাদিকা	১৩৩
অনাথের মা	শ্রীমতী কামিনী রায় বি,এ,	৫২
আমার স্কুল	" গিরিবালা সেন গুপ্তা	১২৫
আদর্শ গৃহকর্ত্রী	কুমারী নলিনীবালা রায়	২৪১
আত্মোন্নতি	শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী	১১৮
উচ্ছ্বাস	" নীরদমোহিনী দেবী	১৪১
উদ্গার	" নিস্তারিণী দেবী	৫,৫১
উপনিবেশ ও বিদেশ যাত্রা	" সম্পাদিকা	২১০
উমার ফুল	শ্রীমতী চারুবালা দেবী	৯
এই কি সেই দেশ	" সরোজিনী চৌধুরী	
কবিতা	৮১,১৬০,১৭৯,২১১,২০৭,২৩০,২৬৪,২৬৭,২৭০,২৭৯	১৩৮
কি খেলা খেলায়	...	১২১
খাসিয়া জাতি	" সম্পাদিকা	২৩
গোয়ালা বৌ	শ্রীমতী কামিনী রায় বি,এ,	১৬৮
জন্মভূমি	" গিরীন্দ্রমোহিনী	২৩
জাপানী উদ্ভিদ	" সরোজিনী বসু	২৭৩
জাতীয় মহাসমিতি	" কুসুমলতা দেবী	১৪১
জাপানী স্কুল	" হেমন্তকুমারী দেবী	২৫৮
জাতীয় শিল্প ও ভারত মহিলা	" সম্পাদিকা	২২৬
জীবন বীণা	" স্বর্ণলতা চৌধুরী	১৩২
ঢাকা উপাসনালয়	" সরোজবালা মল্লিক	৫১
তিব্বতদেশে	" শরৎকুমারী দেবী	২০৩
দাড়িম	" সম্পাদিকা	৭৩
দুর্ভাগের আশ্রয়	শ্রীমতী সরস্বতী দেবী	৬৮
দক্ষিণের পুরুষ শক্তি	" "	৩৫
নববর্ষ	" প্রিয়ম্বদা দেবী বি,এ	১৮৩
নারিকেলের চিন্তা	" সরোজিনী গুহ	১৮০
পায়রা উড়ে যায়	কুমারী সুদেবী দেবী	১২৭
প্রকৃতি	শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মিত্র	৯
প্রার্থনা	" মোক্ষদা সিংহ	১৫৫,২১০
প্রাচীন শিল্পকারিগর আমার বাগান	কুমারী সরস্বতী বসু	৬৬
বালিকাশ্রম	শ্রীমতী সরোজিনী বসু	৭৯
বসন্ত সন্ধ্যা	" অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা	
বিবিধ প্রসঙ্গ	৩,৪৬,৯৩,১১৯,১৬২,১৭০,১৯০,২১৫,২৩৮,২৮১	
বিদেশে বঙ্গবাসী ও প্রবীণা নারী	সম্পাদিকা	১২৫
বিদ্যুৎ	শ্রীমতী গিরিবালা সেন গুপ্তা	১১৭
বিদ্যাসাগর	কুমারী সরোজকুমারী দেবী	১৮১
বীরভূমকাহিনী	শ্রীমতী নীরদবাসিনী বসু	২৩০
ভূমার জাতি	" হেমলতা দেবী	৯৭
ভূমারদিগের আদিপুরুষ	" "	৮৯

বিষয়।	লেখিকা।	পৃষ্ঠা।
বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি,এ	... ৪৯,৮৩
ব্রত	স্বর্গীয়া বনলতা দেবী	... ৩১
ভারতমহিলার আশা	সম্পাদিকা ও সরোজিনী দেবী	... ১৫৯,২৬৯
ভিক্টোরিয়া স্মৃতি ও লেডি কার্জ্জনের সদানুষ্ঠান	সম্পাদিকা	... ২১
ভিক্ষা	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	... ২০৪
ভুবনবিখ্যাত রোমনগরের প্রথম পত্তন	কুমারী লজ্জাবতী বসু	... ২৭
মহিলাদিগের শিল্পচর্চ্চা	শ্রীমতী প্রবোধিনী ঘোষ	... ২০
মহারাণীর স্বর্গারোহণ	„ প্রসন্নময়ী দেবী	... ২৫
মহারাণী ভারতেশ্বরী	সম্পাদিকা	... ৩১
মহারাজ্ঞীর অন্ত্যেষ্টি	শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী	... ৪১
[illegible]	„ স্বর্ণলতা চৌধুরী	... ১২১
মহিলার পরিচ্ছদ	সম্পাদিকা	... ১৬৭
মহিলা সমিতি	„	... ২২৭
মুক্তিলাভ	শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী	... ৮০
মুষ্টিযোগ	„ হেমন্তকুমারী সেন গুপ্তা	১১১,২৩৪,২৮১
যৌবন ও বার্দ্ধক্য	„ প্রসন্নময়ী দেবী	... ১০৩
রন্ধন	„ সম্পাদিকা প্রভৃতি	১৪,৫৪,৭০,১৩৩,১৬২,২১৪,২৫[illegible]
রূপান্তর	„ কুমারী শান্তিময়ী দেবী	১৯৩,২১[illegible],২[illegible]
রমণীর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য	৺ মুক্তকেশী দেবী	... ২০১
শিশু (কবিতা)	শ্রীমতী সারদাময়ী দাসী	... ২[illegible]
শিশু চিকিৎসা	„ চপলাসুন্দরী দেবী	... ২০[illegible]
[illegible] শিক্ষা	কুমারী শান্তিময়ী দেবী	... ৮-
সমালোচনা		... ৬১
সন্তান শিক্ষা	শ্রীমতী সরলাবালা দেবী	... ২০৮,২৫[illegible]
সাধ্বী	„ নিরীন্দ্রবালা দেবী	... ১৯
সামাজিক সমিতি	সম্পাদিকা	...
[illegible]	শ্রীমতী সারদাসুন্দরী ঘোষ	...
[illegible]	„ লীলাবতী মিত্র	...
স্বপন	„ মোহিনী দেবী	... ১১[illegible]
স্বর্গগতা প্রসন্নময়ী দেবী	„ হেমলতা দেবী	... ১৩০
সেই এক দিন	„ সরোজিনী বসু	... ৬২
সেকালের রমণী	„ হেমন্তকুমারী সেন গুপ্তা	... ১৮[illegible]
সেকালের কথা	„ প্রসন্নময়ী দেবী	... ১০[illegible]
সেবা [illegible]	„ নলিনীবালা রায়	... ১৭[illegible]
স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা	শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী চৌধুরী	... ২১
স্ত্রীশিক্ষা	„ প্রিয়ম্বদা দেবী বি,এ ও, নগেন্দ্রবালা দেবী	১০৪,১[illegible]
স্বর্গীয়া মহারাণীর আদর্শ দাম্পত্যপ্রেম	„ সুশীলাবালা বসু	... ৩৬
স্বর্গারোহণ	„ সুশীলাবালা দেবী	... ৪৫
স্নেহময়ী	„ কাদম্বিনী দত্ত	... ৭১
সিংহলিন	„ নিরজাবালা দেবী	... ১৫[illegible]
স্মৃতি	„ প্রসন্নময়ী দেবী	... ২৩১
হিন্দুস্থান	„ সরলা দেবী, বি,এ	... ২৫[illegible]

Scanned with CamScanner

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ৩৬
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

কেবল মহিলাগণকর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

স্বর্গীয় বনলতা দেবী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী।

(৫ম বর্ষ (১৩০৯ সাল।)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসমেত দেড় টাকা মাত্র।

অন্তঃপুর আফিস—৯৫নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Antahpur Office—95, Bechu Chatterjee's Street Calcutta.

Scanned with CamScanner

অন্তঃপুরের পঞ্চমবর্ষের সূচীপত্র।

অকারাদি বর্ণমালানুসারে।

বিষয়	লেখিকা	পৃষ্ঠা
অভিষেক	সম্পাদিকা	৮৫
আমরা জননী	শ্রীমতী মাতঙ্গিনী মজুমদার	১৫৭
উচ্চ শিক্ষা	„ প্রসন্নময়ী দেবী	১১৬,১২৯
উড়িষ্যা ভ্রমণ	„ হেমলতা দেবী	৩৫
একাল ও একালের মেয়ে	„ শরৎকুমারী চৌধুরী	১৮৯
এমূ পক্ষী	সম্পাদিকা	২০৯
কবিতা,	শ্রীমতী কুসুমকুমারী রায়, সরোজিনী বসু, সরোজিনী দেবী, মাতঙ্গিনী মজুমদার, অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা, শান্তিময়ী দেবী, সরলাবালা সেন গুপ্তা, জ্যোতির্ম্ময়ী গুপ্তা, সরলা দত্ত, গিরিবালা সেন গুপ্তা, লীলাবতী দেবী, অন্নদাসুন্দরী ঘোষ, মরকত দেবী, সুনীতিবালা দাসী, শশিমুখী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, চপলাসুন্দরী দেবী, সুনীতিবালা সেন, অসীমাসুন্দরী সোম, হিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা প্রভৃতি।	২৪, ৪৪, ১১০, ১৮০, ২০১, ২২৭, ২৫১,
কবিতার সৌন্দর্য্য,	শ্রীমতী মৃণালিনী রাহা	৭০
কয়েকটী কাজের কথা	„ নলিনীবালা রায়	৪৮
কাশ্মীরের পথে	„ প্রবাসিনী দেবী	১১৮,১৩০
গুজরাটী বিদূষী মহিলাদ্বয়	সম্পাদিকা	১৭
গৃহস্থালীর কথা	শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু	১০৮,১২৭
জাতীয় মহাসমিতি	সম্পাদিকা	২০৭
দীল্লির দরবার	সম্পাদিকা	২০৫,২১৩
দেবীর উদ্দেশে	শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী	১৬৭
দৈবের তামাসা	„ প্রবাসিনী দেবী	৫১
দ্রৌপদি যুধিষ্ঠির সংবাদ	„ নিস্তারিণী দেবী	১৯৮
নব বর্ষের উপহার		১৪
নববধূ	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা	১৪৯
নলিনী	„ কুমুদেন্দু দেবী	১৫৭, ২১৮, ২৩৯
নদীর স্রোত	„ সরোজিনী বসু	১৬৬
নিষ্ফলকামনা	„ গিরিবালা দেবী	১৩

Scanned with CamScanner

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখিকা	পৃষ্ঠা
পত্নীর গুণশীলতা	শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু	১২৫
প্রাচীন মিশর জাতি	„ লজ্জাবতী বসু	৬
প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা		২১, ২০৯, ২৩৪
প্রীতি উপহার	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা	২৩
প্রুসিয়ার রাণী লুইসা	„ নলিনীবালা রায়	২৩৭
ভারত মহিলার শিক্ষা	„ মৃণ্ময়ী সেন	৯১
মর্ম্মিয়ণ	„ স্বর্ণলতা চৌধুরী	৯৩, ১৫২, ১৬৭
রন্ধন	„ নলিনীবালা রায়, ক্ষেমঙ্করী চৌধুরী প্রভৃতি	২২, ৮০, ১৩২
রাজপুত বালা	শ্রীমতী সরলাবালা সরকার	১৯৬
রাণা প্রতাপ সিংহ	সম্পাদিকা	১০২
রেলে বিপদ	শ্রীমতী কমলেকামিনী গুপ্তা	৬৫
রোমান জাতির রীতিনীতি	„ লজ্জাবতী বসু	৩৯
রোগীর পথ্যরন্ধন	শ্রীমতী মনোরমা দাস	১৬৫
লবণ	সম্পাদিকা	৪৭
বনফুল	শ্রীমতী সরোজিনী বসু	১৬৬
বর্ষারম্ভ	সম্পাদিকা	১
বিপত্নীকের পত্নী	শ্রীমতী নৃত্যকালী দেবী	১৩৮
বিবিধ প্রসঙ্গ	১৮, ৬২, ৮১, ১২২, ১৪৭, ১৮৪, ২১০, ২৩৪, ২৫৩	
বৈধব্য জীবনের চিত্র	জনৈক হিন্দু বিধবা	১৯১
ব্রহ্মদেশের কথা	শ্রীমতী মৃণালিনী রাহা	১৬১
শোক গীতি	„ ইন্দুমতী দেবী	১৫১
সার জন উড্‌বরণ	সম্পাদিকা	১৮৩
সূতিকা গৃহ	„	১৩৩
সুমাতা	শ্রীমতী নলিনীবালা রায়	২২৫
সেরা মার্টিন	„	৩
সেবা	শ্রীমতী বিনোদিনী ঘোষ	৭২
সেবাব্রত	„ কাদম্বিনী দত্ত	২৫
স্বর্গীয় দীননাথ দত্ত	জনৈক মহিলা	২৪৫
হিন্দু অনাথাশ্রম	সম্পাদিকা	৭৭

Scanned with CamScanner

অন্তঃপুরের ষষ্ঠবর্ষের সূচীপত্র।

অকারাদি বর্ণমালানুসারে।

বিষয়	লেখিকা	পৃষ্ঠা
অন্তঃপুর ও বিলাসিতা	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী গুপ্তা	২৫
আখ্যান মালা	„ লজ্জাবতী বসু	১২৪
আত্মোসর্গ	সম্পাদিকা	১২১
আমাদের জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব	শ্রীমতী সুবাসিনী সেহানবিশ	২২৮
ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী ও ভারত সাম্রাজ্ঞী	সম্পাদিকা	২৩০, ২৭৪
একখানি পত্র	জনৈক মহিলা	১৩২
একান্নভুক্ত পরিবারের অশান্তি নিবারণের উপায় কি ?	শ্রীমতী নিরুপমা দেবী	১৯৩
এতদ্দেশীয়া মহিলাদের শিল্প শিক্ষা	„ কুমুদিনী সিংহ	২৭৭
কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার	„ লজ্জাবতী বসু	১৪[illegible]
কবিতা ... শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু, শ্রীমতী কুমুদেন্দু দেবী, শ্রীমতী গিরিবালা সেন গুপ্তা, শ্রীমতী সরলা দত্ত, শ্রীমতী শান্তিনী দেবী, শ্রীমতী সরোজিনী বসু, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ, শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, শ্রীমতী মোহিতকুমারী দেবী, শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী, শ্রীমতী কাদম্বিনী দত্ত প্রভৃতি		১২, ২৭, ৬৭, ৯০, ১১৬, ১৩[illegible], ১৬১, ১৮৫, ২১৫, ২৩৩, [illegible]৬০, ২৭৯
গৃহস্থালীর কথা	...	[illegible]
গৃহিণী ও গৃহ শুশ্রূষা	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী গুপ্তা	১১৪
চারিটী আদর্শ রমণী	„ অসীমাসুন্দরী সোম	২৪[illegible]
জাতীয় মহাসমিতি	সম্পাদিকা	২০[illegible]
জীবন সংগ্রাম	শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসু	২৫৫
দুটী বোন	কুমারী সুরুচিবালা দাস গুপ্তা	২০[illegible]
ধর্ম্ম	শ্রীমতী প্রিয়বালা সেন গুপ্তা	২১৬
নলিনী	„ কুমুদেন্দু দেবী	৪০, ৬১, ৮[illegible], ১০৮, ১২৭, ১৫৪, ২০০, ২২১
নব বর্ষের অভ্যর্থনা	সম্পাদিকা	১
নির্ব্বন্ধ	শ্রীমতী গিরিবালা সেন গুপ্তা	২৪১
পতি	„ হেমন্তকুমারী গুপ্তা	১১[illegible]
পরিবারে শিশুশিক্ষা	„ সরোজিনী দেবী	৩০
পারস্য জাতি	সম্পাদিকা	৬৫

Scanned with CamScanner

প্রাচীন ব্রিটন জাতি ...	শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু ...	৪৯
ফুলওয়ালী ...	„ অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা ...	৭৩
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ...	„ কুলদা দেবী ...	২৬৭
মহিলার স্বাস্থ্য ...	জনৈক হিন্দু মহিলা ...	৫৭
মুঙ্গের ...	শ্রীমতী কুলদা দেবী ...	১৫১
রমণীর পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য	৺ বনলতা দেবী ...	৯
রমণীর প্রভাব ...	শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু ...	৯৭
রন্ধন	২৪, ৮৯, ১০৩, ১৩৭, ১৬১, ২৩২, ২৫৯, ২৭৮	
	শ্রীমতী কমলেকামিনী গুপ্তা, শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী চৌধুরী, শ্রীমতী ইন্দুবালা ঘোষ, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী সেন গুপ্তা, শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা প্রভৃতি।	
রন্ধনে রমণী ...	শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ...	২২৫
রঙ্গিন সাড়ী ...	„ গিরিবালা দেবী ...	১৬৯
লজ্জাশীলতা ...	জনৈক হিন্দু মহিলা ...	৫৫
বন্ধুতা ও প্রেম ...	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা ...	২৬৫
বর্ম্মা বর্ম্মী ...	„ মৃণালিনী রাহা ...	১৭৭
বর্ষায় আটদিন ...	„ মনোরমা দেবী	১৩, ৩৭, ১৭৯,
বলিদান ...	„ পুষ্পমালা দেবী ...	১৩৬
বঙ্গে সূচী শিল্প প্রদর্শনী ...	... ...	২১৩
বাঙ্গালী জাতি ...	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা ...	১০০
বিধবা ...	„ প্রমীলাসুন্দরী দেবী ...	১০৪
বিবিধ প্রসঙ্গ ...	১৬, ৪৮, ৭০, ৯৪, ১২০, ১৪১, ১৬৭, ১৮৮, ২৩৮, ২৬৪, ২৮৩	
সকল দিন সকলের সমান যায় না	শ্রীমতী আয়সা খাতুন ...	২৫৩
সন্তান শিক্ষা ...	„ প্রবোধিনী ঘোষ ...	২
সমালোচনা ও প্রাপ্তি স্বীকার	...	২১৬, ২৩৭
সামাজিক ছোট কথা ...	সম্পাদিকা ...	৩৫
সীতা ...	শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ...	২১৭
সুজাতার পণ ...	সম্পাদিকা ...	১৮২
সূতিকাগারে প্রসূতির শুশ্রূষা	শ্রীমতী ননীবালা দাসী	১০৬
স্ত্রী-রোগ ...	... ...	৭৮
হিন্দু সমাজে বঙ্গনারী ...	শ্রীমতী সুখদা গুপ্তা ...	২৬৯

Scanned with CamScanner

২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।] বৈশাখ, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

বিষয়।

		পৃষ্ঠা।
১।	নববর্ষারম্ভ।	১
২।	দণ্ডকারণ্যের পৌরাণিক ইতিহাস ...	৫
৩।	নূতন বৎসর।	১১
৪।	শিশু বিনয়ন। ...	১৫
৫।	স্বাস্থ্যরক্ষা।	১৮
৬।	প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ...	২৩
৭।	সংবাদসার।	২৪

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য .. .. ১৷৷০ টাকা মাত্র।
মফস্বলে ডাক মাসুল .. .. ।৵০ আনা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য .. .. ৶০ আনা।

ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মূল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে ৪ মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট 'বঙ্গমহিলা' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মূল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... /০ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং। } শ্রীভুবনমোহন সরকার, সম্পাদক।

স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকারের স্মরণার্থক চিহ্নের নিমিত্ত চাঁদা।

রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতি এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহোদয় কর্ত্তৃক একটী সভা সংস্থাপিত হইয়া চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। চাঁদা গ্রহণের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, অতএব দাতাগণ আমার নিকট স্ব স্ব দান প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীভুবনমোহন সরকার,
সভার সম্পাদক।

Digitized with CamScanner

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অশোকে রাজবালা	৩৩
অসভ্যজাতির বিবাহপ্রথা	৫৮
অমৃতে গরল	১০৬
ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী	২৪৫
কলিকাতার লোকসংখ্যা	১৬২
কল্পনা ও কবি	১৯৯, ২২১
কামিনী-ফুল	৫৬
কাশ্মীর-কুসুম	১০৪
কালীপূজা ও ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া	১৪৫, ১৬৯
দণ্ডকারণ্যের পৌরাণিক ইতিহাস	৫
নববর্ষারম্ভ	১
নূতন বৎসর	১১
পদ্মিনী-চরিত	১৩৪, ১৭৯
পদার্থ-বিদ্যা	২২৫
প্রভাত	১৭৩
প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	২৩, ৪৮, ৭১, ২৩৩
প্রণয়	২৭৪
ফিয়ার সাহেবের বিদায়	৯২
বঙ্গমহিলা	২৫, ৪৯, ৭৩, ৯৭, ১২১
বর্ত্তমান সমাজ	২০৪
বঙ্গদেশে বর্ণবিভাগ	২৩১, ২৫২
বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোক-দিগের পরীক্ষা	২৭১
বীরজননী-বিলাপ	১২৭
বামাগণের রচনা :—	
১। আমি ভালবাসি না ?	৪৭
২। আমি কি উন্মাদিনী ?	১৬৪
৩। আমি তো বিধবা	১৮৬
৪। আর কেন ?	২০৯
৫। কি দিব তোমায় ?	৯৫
৬। কে লিখিল ?	২৩৫
৭। কোন একটী পাখীর প্রতি	১১৭
৮। "নিদাঘ নিশিতে"	৯৩
৯। পূর্ণশশী	৪৬
১০। বসন্ত	২৫৯
১১। বিরহিণী	১৮৯, ২১৩
১২। ভ্রাতৃবিরহে	১১৪
১৩। মৃত পত্নীর নিমিত্ত পতির বিলাপ	২৩৮
১৪। লঙ্কার পতন	৬৫, ২৬১
১৫। শিবচতুর্দ্দশী	১৪৩
১৬। সংসারের-সার রত্ন	২৮৭
ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী	২৬৫
মিষ্টভাষিতা	২৬৯
রমণী-হৃদয়	১৯৩
শিশু বিনয়ন	১৫, ৮৫
শেষ দেখা	৮০
সূর্য্য	১৪০
সংবাদসার	২৪, ২১৬
স্ত্রীশিক্ষা ও ছাত্রীবৃত্তি	৪৩
স্ত্রী ও পুরুষ	২৪১
স্ত্রী-স্বাধীনতা	২১৭
স্বপ্নশক্তি	১৫২
স্বাভাবিক সংস্কার	৩৯, ৮৯
স্বাস্থ্য-রক্ষা	১৮, ৬১, ১০৯, ১৫৮, ১৮৪, ২০৭, ২২৮, ২৫৬, ২৭৭
সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার	২৮৭

Scanned with CamScanner

২য় খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।] [মাঘ, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা
১।	স্ত্রী-স্বাধীনতা।	২১৭
২।	কল্পনা ও কবি।	২২১
৩।	পদার্থ-বিদ্যা।	২২৫
৪।	স্বাস্থ্য-রক্ষা।	২২৮
৫।	বঙ্গদেশে বর্ণবিভাগ।	২৩১
৬।	প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ...	২৩৩
৭।	রামাগণের রচনা।	২৩৫

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কালের শৃঙ্গবাদন	২২৩
চা-খড়ি ...	১০৮
চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা কর্ত্তৃক অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষা ...	২৮৪
চোরবাগান বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক	২৮৬
জানকী ...	৮১
দময়ন্তী ...	১০৪
দুই একটী কথা মাত্র ...	৬
দুর্গাপূজা ...	১৩০
দুর্দ্দৈবে সুযোগ নষ্ট ...	১৮৩
ধর্ম্মের পুরস্কার ...	২৭২
বৃথা পাখুরিয়া কয়লা ...	২৫১
পারিবারিক সংস্কার ...	২৩৪
প্রজাপতি ...	৮৫
প্রতিধ্বনি ...	২৪৭
প্রাকৃত ভূগোলবিজ্ঞান	৩৯,৮৮,১৬০
বঙ্গমহিলা (গদ্য)	২১৭,২৪১,২৬৫
বঙ্গমহিলা (পদ্য) ...	১৭
বঙ্গমহিলার স্বপ্ন ...	৬৪
বাঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার	১১, ২৮, ৭৩, ১৭৮, ১৯৩, ২৭৭
বাসন্ত প্রভাত ...	২৩৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বামাগণের রচনা ;—	
১। অনিত্য সংসার ...	১৬৬
২। আশা ...	২১
৩। ঈশ্বর ...	১২০
৪। ঈশ্বরের প্রতি ...	২৩
৫। কবি অভাবে কবিতা ...	১৯০
৬। নারীজন্ম কি অধর্ম্ম ...	৯৩
৭। চিন্তা	২৬০
৮। পতি সতীর একমাত্র গতি	৪৬
৯। প্রাবৃটকমল ...	৯৫
১০। বঙ্গনারী ...	৪৫
১১। ভারতমাতা ...	১৬৩
১২। ভীষণা ...	১১৯
১৩। মনুষ্য জীবন ...	১১৭
১৪। মনের প্রতি উপদেশ	১৪৪
১৫। রজনী ...	৬৯
১৬। লর্ড ক্লাইবের আত্মহত্যা ...	২১৩
১৭। শরৎশশী দর্শনে সখীর প্রতি ...	২১২
ভানুমতী ...	২০৩, ২২৬, ২৫৪
ভারত-কমলা ...	৩৫
ভারতে কুমার ...	১৭৪
ভূমিকা ...	১
মহারাষ্ট্রীয় জাতি ...	১৫৪

Scanned with CamScanner

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মাননীয়া মিসৃষ্ট্রেস ফিয়ারের অভিনন্দন	২৮৭
মুক্তা	৬১
যুবরাজ (সচিত্র)	১৬৯
শারদীয় মহোৎসব	১৪০
শাসনপ্রণালী	২৫, ৭৮
সমস্যা	৯৩
সরোজিনী	২০১
সাবিত্রী	৫৮
স্বাস্থ্যরক্ষা (সচিত্র)	১৯, ৬৬, ১১০, ১৮৩, ২০৮
স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা	৫৫
স্ত্রীশিক্ষা	৯৭, ১২১
স্বর্গীয় কালীপ্যারীচরণ সরকার	১৪৫
(ঐ) বিলাপ লহরী	১১১
সংবাদসার ২৪, ৪৮, ৭২, ৯৬, ১২০, ১৬৬, ১৯২, ২১৩, ২৬৪	
হিন্দুজাতির পুরাবৃত্ত	৪৯

Scanned with CamScanner

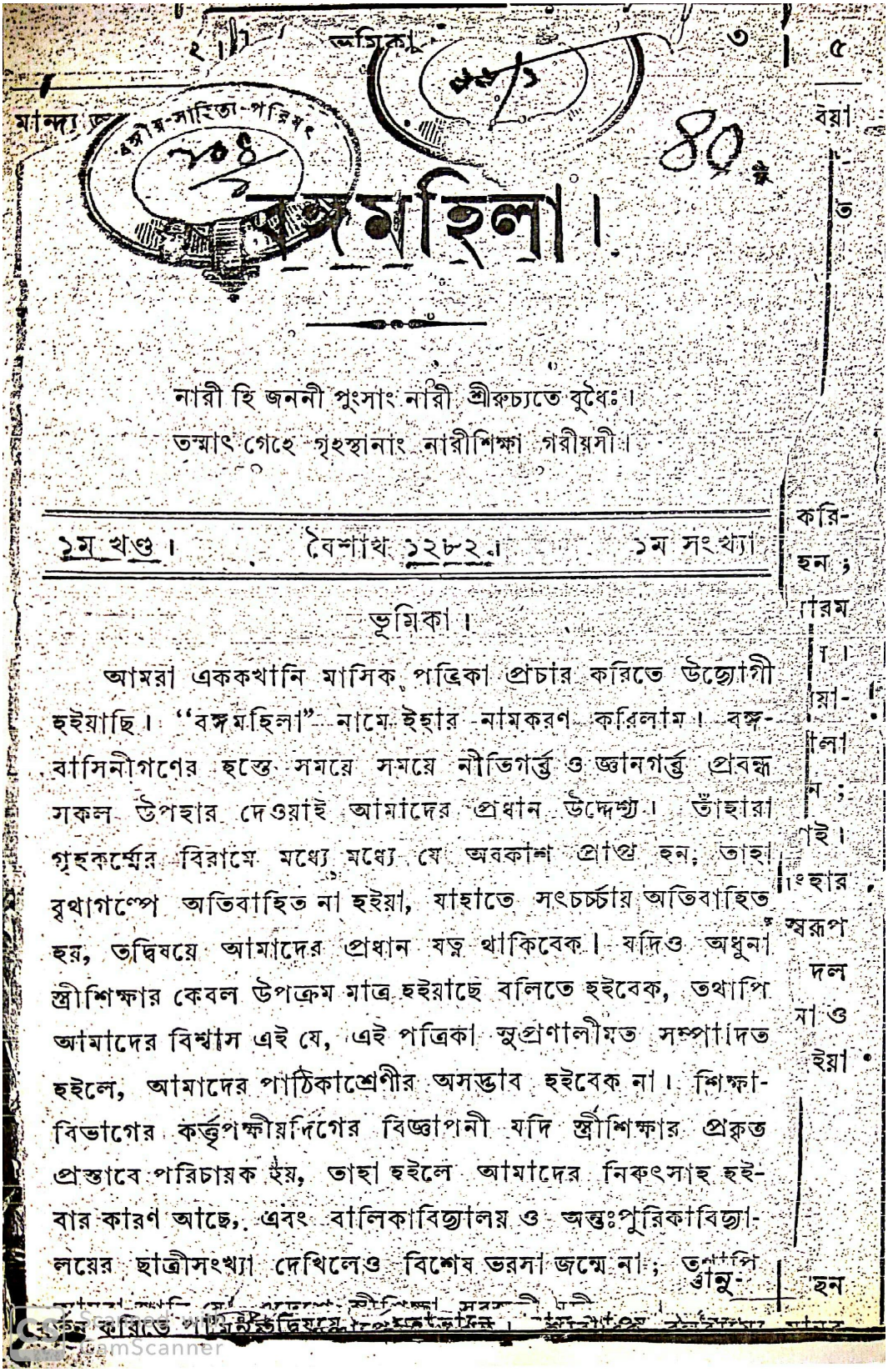

বঙ্গমহিলা।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

১ম খণ্ড। বৈশাখ ১২৮২। ১ম সংখ্যা

ভূমিকা।

আমরা এককখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। "বঙ্গমহিলা" নামে ইহার নামকরণ করিলাম। বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নীতিগর্ব্ভ ও জ্ঞানগর্ব্ভ প্রবন্ধ সকল উপহার দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহারা গৃহকর্ম্মের বিরামে মধ্যে মধ্যে যে অবকাশ প্রাপ্ত হন, তাহা বৃথাগল্পে অতিবাহিত না হইয়া, যাহাতে সৎচর্চ্চায় অতিবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের প্রধান যত্ন থাকিবেক। যদিও অধুনা স্ত্রীশিক্ষার কেবল উপক্রম মাত্র হইয়াছে বলিতে হইবেক, তথাপি আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই পত্রিকা সুপ্রণালীমত সম্পাদিত হইলে, আমাদের পাঠিকাশ্রেণীর অসদ্ভাব হইবেক না। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বিজ্ঞাপনী যদি স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত প্রস্তাবে পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে আমাদের নিরুৎসাহ হইবার কারণ আছে, এবং বালিকাবিদ্যালয় ও অন্তঃপুরিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা দেখিলেও বিশেষ ভরসা জন্মে না; তথাপি

Scanned with CamScanner

১ম সংখ্যা, বৈশাখ
৫ম বর্ষ। ১৩০৯।

অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদিকা—শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

অন্তঃপুর আফিস—২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Antahpur Office,—20, Cornwallis Street, Calcutta.

Scanned with CamScanner

উচ্চ শিক্ষিতা গুজরাটী মহিলাদ্বয়,

শ্রীমতি বিদ্যা রমণভাই নিলকান্থ, এবং শ্রীমতি সারদ সামন্ত মেটা।

MOHILA PRESS. 41-3 PUTTULDANGA ST.

Scanned with CamScanner

কেবল মহিলাদিগের জন্য।

আমরা মহিলাদের ব্যবহারের জন্য ও নামকরণ, জন্মদিন, আইবড় ভাত, বিবাহ প্রভৃতিতে উপহার দেওয়ার জন্য নানা প্রকার জিনিষ আমদানী করিয়াছি।

কি প্রকার জিনিষ আমদানী করিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে দিতেছি—১২ হাত লম্বা ও ৪৫ ইঞ্চি চওড়া পিয়াজ রঙ্গের ও ছাই (Ash) রঙ্গের সাড়ি, ১১ হাত লম্বা ও ৪৫ ইঞ্চি চওড়া দেশী কলের সাড়ী, ১১ হাত লম্বা ও ৪৫ ইঞ্চি চওড়া ঢাকাই সাড়ী, এতদ্ভিন্ন ১০ হাত লম্বা ও ৪৪ ইঞ্চি সেখাড়া নানা রকমের ধোয়া ও কোরা সাড়ী ও ধুতী, তাহা ...াল ব্রোচ, প্রজাপতি, ফুল, সোণার ব্রোচ ও অঙ্গুরি, হাতির দাঁতের পাখা, চিরুণি ও নানাবিধ খেলনা এবং আরও নানাবিধ সুন্দর সুন্দর জিনিষ আমদানী করিয়াছি। আমরা মহিলাগণকে একবার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

আই, বি, গুপ্ত,

৮২ নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

Scanned with CamScanner

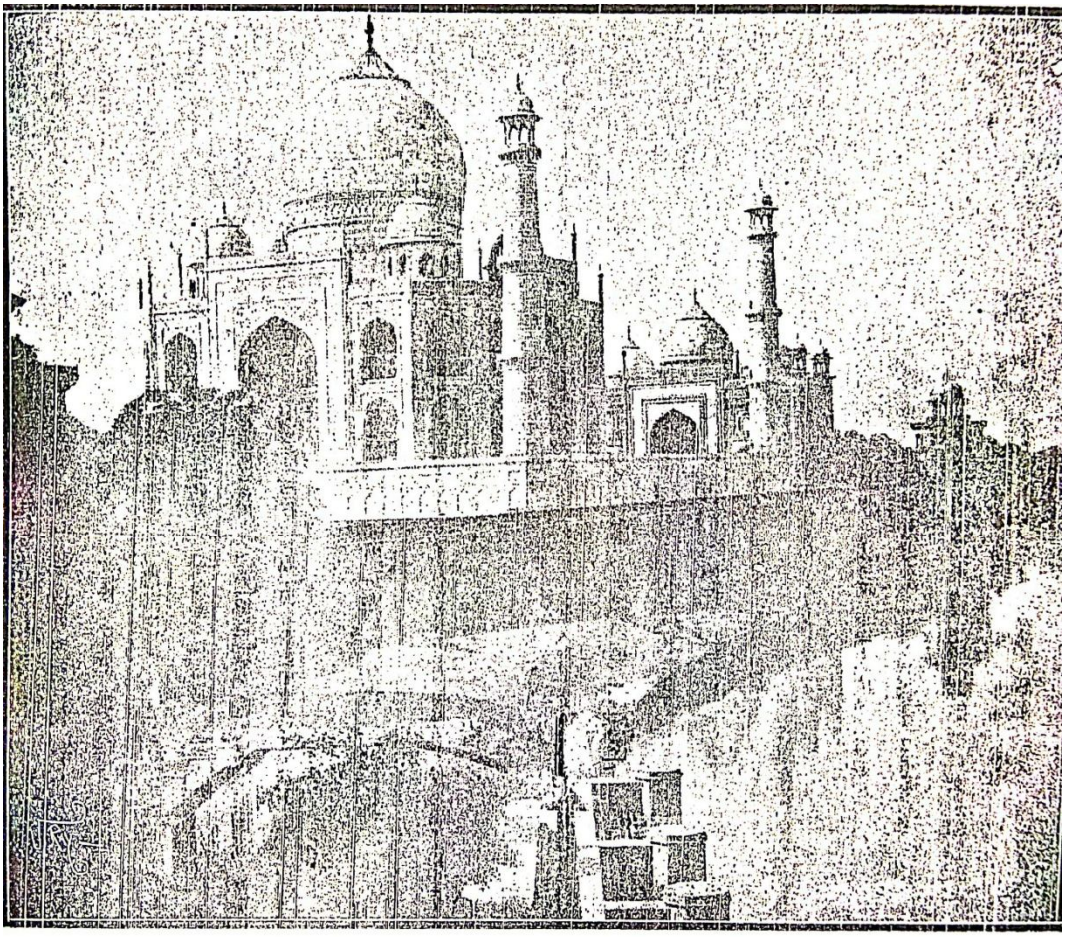

যমুনা ঘাট, হইতে তাজমহল।

Scanned with CamScanner

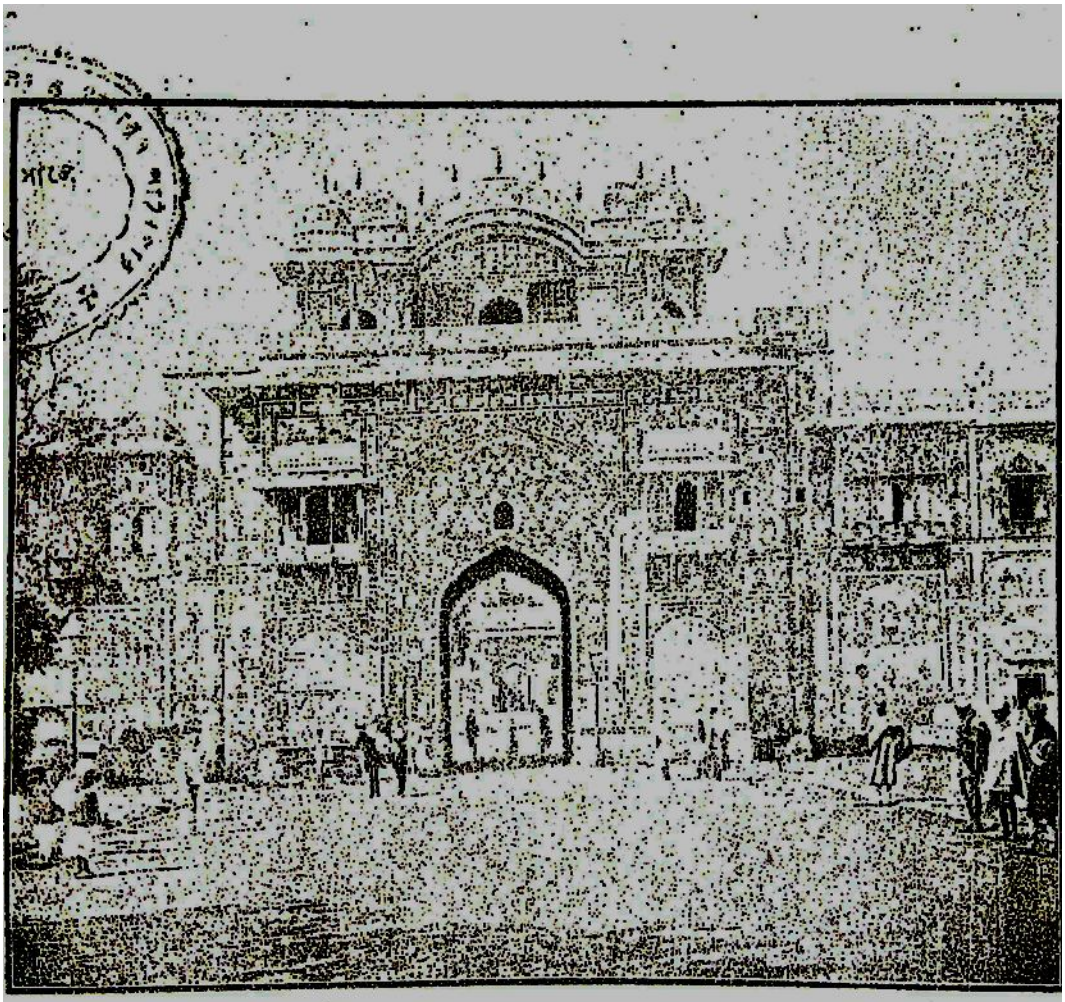

জয়পুর মহারাজের প্যালেস্।

Scanned with CamScanner

ক্রমে নীরস ও গাঢ় হয়। পুনঃ সঙ্কোচন দ্বারা কীটাঙ্গ যেরূপ তরঙ্গের ন্যায় সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ বৃহৎঅন্ত্রের মাংসপেশীর পুনঃ সঙ্কোচন দ্বারা মল ক্রমে মলদ্বারের নিকট অগ্রসর হয়। মলদ্বার একটী অঙ্গুরীয়ের ন্যায় মাংসপেশীদ্বারা বেষ্টিত, এবং উহার সঙ্কোচিত অবস্থা প্রযুক্ত ঐ দ্বার বদ্ধ থাকায়, মল আপন ইচ্ছায় বহির্গত হইতে পারে না। মলত্যাগ আমাদিগের ইচ্ছাধীন, এবং বিশেষ বেগ দ্বারা বৃহৎঅন্ত্র, উদর ও অন্যান্য মাংসপেশী সঙ্কোচিত হইয়া এবং মলদ্বারের মাংসপেশী বর্দ্ধিত হইয়া মল নির্গত হয়।

পাক-যন্ত্র।

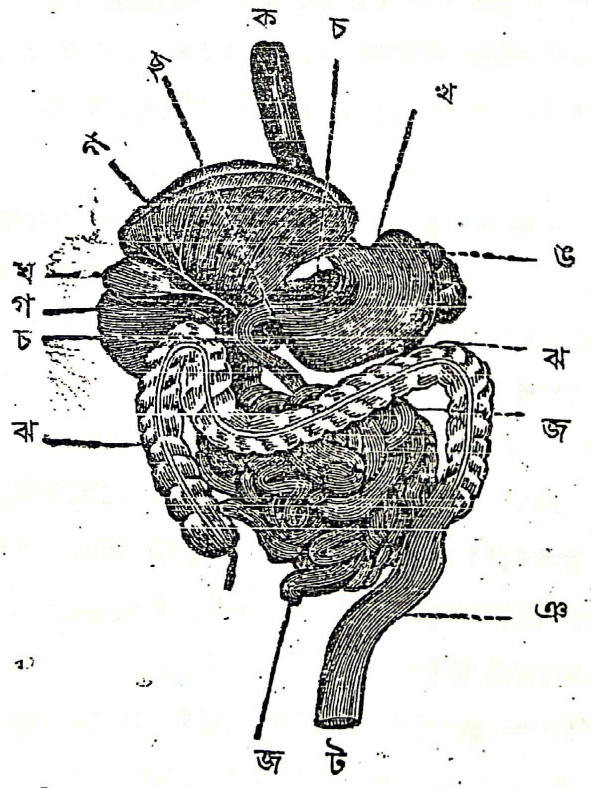

ক, অন্ননালী। খ, পাকস্থলী। গ, গ, যকৃত। ঘ, পিত্তস্থলী। ঙ, প্লীহা। চ,চ, ক্লোমযন্ত্র। ছ,পক্বাশয়। জ,জ, ক্ষুদ্রঅন্ত্র। ঝ, বৃহৎ-অন্ত্র। ঞ, মলাশয়। ট, মলদ্বার।

Scanned with CamScanner

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা :

- খাস্তগীর, আশিস, *উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা,* কলকাতা : সোপান, জানুয়ারি ২০১৪ ।
- ঘোষ, বারিদবরণ সম্পাদিত, *আমার জীবন,* রাসসুন্দরী, নয়াদিল্লি : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০৮ ।
- ঘোষ, বারিদবরণ সম্পাদিত, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* শিবনাথ শাস্ত্রী, কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, ২০০৯ ।
- ঘোষ, বিনয়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০,* কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ।
- ঘোষ, বিনয়, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : প্রকাশ ভবন, নভেম্বর ২০১৫ ।
- চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ, *অন্দরে অন্তরে,* কলকাতা : স্ত্রী, ২০১০।
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, *বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, চৈত্র ১৩৮৭ ।
- চৌধুরী, শ্রীভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় পর্যায়,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫ ।
- চন্দ্র নাথ, রাখাল সম্পাদিত, *উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা,* কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৮ ।
- দত্ত, মধুসূদন, *মধুসূদন রচনাবলী,* কলকাতা : সাহিত্যম, ২০০৫ ।
- দেবীচৌধুরানী, ইন্দিরা অনুলিখিত ও সম্পাদিত, *পুরাতনী,* জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কলকাতা : আনন্দ, ডিসেম্বর ২০১২ ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা, *নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব,* কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রাবণ ১৪১৯ ।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাময়িক-পত্র (অখণ্ড)*, কলকাতাঃ করুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১৩
- বসু, স্বপন, *সতী,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, আগস্ট ১৯৮২ ।
- বসু, স্বপন সম্পাদিত, *উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা,* কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৮ শ্রাবণ ১৪১৬ ।
- বসু, স্বপন সম্পাদিত, *সেকাল আর একাল,* রাজনারায়ণ বসু, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০৮ ।
- বসু, স্বপন, *সংবাদ- সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, অক্টোবর ২০০৩ ।
- বসু, স্বপন, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২৯ শে মে ২০১৫ ।
- ভট্টাচার্য, ঊষারঞ্জন, *স্মরি বিস্ময়ে,* কলকাতা : সিগনেট প্রেস, অক্টোবর ২০১৮ ।
- মামুন, মুনতাসীর, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ- সাময়িকপত্র*, ঢাকা : অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ।
- মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন, *সুশীলার উপাখ্যান,* অজ্ঞাত ।
- মুরশিদ, গোলাম, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, জানু ২০০১ ।
- রায়, অলোক, *উনিশ শতক,* কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১২ ।
- রায়, অলোক, গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাংলা,* কলকাতা : পারুল, ২০১৩।
- রায়, বিনয়ভূষণ, *অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা,* কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ২০১৫ ।
- রায়, ভারতী সংকলন ও সম্পাদনা, *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা,* কলকাতা : আনন্দ, ডিসেম্বর ২০১৪ ।
- সরকার, ড. অজয়েন্দ্রনাথ, *উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্করচনা,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৮২ ।

- সান্যাল, মনস্বিতা, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *প্রবন্ধ সমগ্র,* ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কলকাতা : চর্চাপদ, সেপ্টেম্বর ২০১০ ।
- সাহা, অর্ণব, *উনিশ শতক বাঙালি মেয়ের যৌনতা*, কলকাতা : প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৭।
- সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* কলকাতা : আনন্দ, মাঘ ১৪১৮।

ইংরেজি :

- Banerjee, Sumanta. *The Parlour and The Street: Elite and Popular Culture in Nineteenth-Century*. Calcutta: Seagull Books. 2018
- Beauvoir, de Simon. *The Second Sex*. Vintage Classics. 1997
- Dutta Gupta, Sarmistha, *Identities and Histories: Women's Writing and Politics in Bengal.* Kolkata: Stree. 2010
- Hooks, Bell. *Feminism is for Everybody*. USA: Passionate Politics. 2000
- Norval, Emily. *Research Into Women's Magazines And The Social Contribution of Womenhood*. Leeds: University of Leeds. September 2011
- Sarkar Sumit & Tanika Sarkar. *Women And Social Reform In Modern India.* Permanent Black. 2011
- Solnit, Rebecca. *Men Explain Thing to Me.* USA: 2014

পত্রিকা :

- *বঙ্গমহিলা ১ম খণ্ড, ১-১২ শ সংখ্যা*, ১২৮২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪১৮/১
- *বঙ্গমহিলা মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা ২য় খণ্ড, ১-১২ শ সংখ্যা,* ১২৮৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪১৮/২
- চৌধুরী, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী সম্পাদিত, *অন্তঃপুর ৪ র্থ বর্ষ, ১৩০৭-১৩০৮,* কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ক্রমিক সংখ্যা ৩৫
- চৌধুরী, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী সম্পাদিত, *অন্তঃপুর ৫ম বর্ষ, ১৩০৯,* কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ক্রমিক সংখ্যা ৩৬
- চৌধুরী, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী সম্পাদিত, *অন্তঃপুর ৬ ষ্ঠ বর্ষ, ১৩১০,* কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ক্রমিক সংখ্যা ৩৭

ওয়েবসাইট :

- Heidelberg University Library: Periodicals and Newspapers from Bengal.https://www.ub.uniheidelberg.de/Englisch/fachinfo/suedasien/zeitschriften/bengali/overview.html
- www.wikipedia.org/wiki/woman
- www.wikipedia.org/wiki/modernity
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/list_of_women%27s_magazines
- https://m.sparknotes.com
- https://ndl.iitkgp.ac.in
- https://m.shutterstock.com/search/woman+shadow
- Goodreads https://g.co/kgs/rz5gXR

গ্রন্থাগার :

- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগীয় গ্রন্থাগার
- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য বিভাগীয় গ্রন্থাগার
- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার সংগ্রহশালা